মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা
ডিসেম্বর ২০২৪
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩১
জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৬
বর্ষ ৪৪
সংখ্যা ০৩
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩

দারসুল কুরআন

আল্লাহর নি'য়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করার পরিণতি
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৪

চিন্তাধারা

ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধনীতি
ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী ॥ ১৫
মুসলিম উম্মাহ্‌র উত্থান কিভাবে পতনে পরিণত হলো
আতাউর রাহমান নাদভী ॥ ৩১
'মব জাস্টিস' : সম্প্রতি একটি আলোচিত ইস্যু
এডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী ॥ ৩৫
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া সম্পর্ক
ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ॥ ৩৯
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলাম প্রচারে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ:
একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥ ৪২

আন্তর্জাতিক

লাগামহীন ইসরাইল ॥ মীযানুল করীম ॥ ৫২
প্রশ্নোত্তর ॥ ৬১

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক
প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ :
সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com
ISSN : 1815-3925
মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

দেশের নাম	সাধারণ	রেজিঃ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মনি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা)-এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়। অথবা-
- ✳ বিকাশ মার্চেন্ট নাম্বারে পেমেন্ট করা যায়- ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

সম্পাদকীয়

মহান বিজয়ের মহিমান্বিত মাস ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালে এ মাসের ১৬ তারিখে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়। রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার লাল সবুজ পতাকা। এদিনেই বাংলাদেশের আকাশে উদিত হয়েছে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অনেক ত্যাগ ও প্রাণের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। স্বাধীনতার এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধ নামে খ্যাত। বস্তুত: শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্য ও অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয় এবং সে যুদ্ধে এদেশের জনগণ বিজয় লাভ করে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৪৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু যে চেতনা নিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা হোঁচট খেয়েছে বার বার। কখনো একদলীয় শাসন, কখনো সামরিক শাসন আবার কখনো শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে গণতন্ত্র বিঘ্নিত হয়েছে বার বার। একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে শোষণ, এক শ্রেণী আমলা ও রাজনীতিবিদের ঘুষ-দুণীতি ও আত্মসাতের মাধ্যমে শোষণ, সন্ত্রাস, গুম, খুন, ছিনতাই, নারী নির্যাতন ইত্যাদি স্বাধীনতাকে অর্থবহ হতে দিচ্ছে না। এ সকল কারণে স্বাধীনতার সুফল জনগণ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছেনা এবং কাঙ্ক্ষিত শান্তি, সম্মৃদ্ধি ও অগ্রগতিও অর্জিত হচ্ছে না।

ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ লুট, বিদেশে অর্থ পাচার, মেগা প্রকল্পের নামে মেগা দুর্নীতি এ দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দেয়। দেশের বিভিন্ন সেক্টরে চাকুরির ক্ষেত্রে কোটার নামে স্বজন ও দলীয় লোকদেরকে নিয়োগদান করে মেধাবীদেরকে বঞ্চিত করে প্রশাসনকে দলীয়করণ করা হয়। এদের অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ ও রুষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে জুলাইয়ের শুরু থেকে বৈষম্য, দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে ছাত্র-জনতার দুর্বার আন্দোলন। এ আন্দোলন দমনের জন্য স্বৈরাচারী সরকার বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। তবে সবকিছু উপেক্ষা করে সহস্র প্রাণের বিনিময়ে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট, ২০২৪) ছাত্র-জনতার বিজয় অর্জিত হয়। যে বিজয়কে নতুন স্বাধীনতা হিসেবে অখ্যায়িত করা হয়। এ নতুন বিজয়ের ফলে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এজন্য সরকার ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। আবার ৫ আগস্ট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে নতুনভাবে দেশকে স্বাধীন করেছে। এখন তাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে অন্যায়, জুলুম, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, শোষণ-বঞ্চনা, গুম, খুন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। সমাজ থেকে এগুলো উৎখাত করতে পারলেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত হবে। “অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বো, দেশকে গড়বো” এটাই হোক বিজয় দিবসে আমাদের অঙ্গীকার। ■

আল্লাহর নি‘য়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করার পরিণতি

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

{وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ}

অনুবাদঃ ‘আর যদি আমরা মানুষকে আমাদের রহমাত আস্বাদন করাই। তারপর আমরা তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেই। তখন সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর যদি দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর আমরা তাকে সুখ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলবে, আমার খারাপ বিষয়গুলো দুর হয়ে গেছে। আর সে তখন উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়। তবে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরই জন্য ক্ষমা ও বিশাল প্রতিদান রয়েছে’, [সূরা হুদ, ১১: ৯-১১]।

নামকরণঃ এ সূরার ৫৩ নং আয়াত; {قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ} তারা বলল, হে হুদ! তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণসহ আসনি’, এ উল্লেখিত ‘হুদ’ নামটিকেই নাম হিসেবে স্থির করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ সূরা হুদ মাক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি অন্যতম সূরা, [ইবন কাসীর ৪/৩০২। আল-বাগাভী উল্লেখ করেছেন যে, তবেঃ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} আয়াতটি নং ১১৩ মাক্কী নয়, [তাফসীরুল বাগাভ ৪/১৫৬]।

মূল বিষয়বস্তুঃ আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি দা‘ওয়াত, মুসলিম সমাজের প্রতি বিভিন্ন নীতিমালা পেশ, উপদেশ দান এবং পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার।

ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ মানুষের স্বভাবের মধ্যে ভাল গুণও রয়েছে এবং মন্দ গুণও রয়েছে। কোন কোন সময় মানুষের মধ্যে খারাপ ও মন্দ গুণাগুণগুলো প্রবল হয়ে উঠে। মহান আল্লাহ আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। মানুষের এ সব খারাপ ও মন্দ প্রবণতা ও দোষগুলো অবহিত করেছেন। আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা‘আলা সে বিষয়টি পরিস্কার করে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

‘আর যদি আমরা মানুষকে আমাদের কাছ থেকে রহমাত আস্বাদন করাই। তারপর আমরা তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেই। তখন সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর যদি দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর আমরা তাকে সুখ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলবে, আমার খারাপ বিষয়গুলো দুর হয়ে গেছে’। অর্থাৎ একদল মানুষের স্বভাব তো এমন যে, তারা যখন ভাল অবস্থার পরে খারাপ অবস্থার মুখোমুখি হয় তখন তাদের মধ্যে ভবিষ্যতের ব্যাপারে হতাশা ও নিরাশা নেমে আসে। অপরদিকে তাদের অতীতের সুখ- শান্তি ও ভাল অবস্থার দরুন আল্লাহ তা‘আলার কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করার পরিবর্তে কুফরী করে এবং তাঁর নি‘য়ামাতকে অস্বীকার করে। মনে হয় সে ব্যক্তি যেন তার জীবনে কোন কল্যাণই দেখতে পায়নি। আবার বর্তমানে অনাকাঙ্খিত অবস্থার মধ্যে থাকার কারণে সে মনে করে যে, তার এই অবস্থার আর কোন পরিবর্তন হবে না। তার জীবনে বোধহয় আর স্বস্তির দিন আসবে না এবং ভাল কিছুর আশা করে না, [তাফসীরুল কুরতুবী ৯/১১, তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৩০৯]। উল্লেখ্য যে, আয়াতে কাফির বা মু’মিন সকলকেই শামিল করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির মনে করেন, এর দ্বারা কাফির জাতিকে বুঝানো হয়েছে; কেননা বর্ণিত গুণাগুণ, যেমন; নিরাশ হওয়া, কুফরী করা, অহংকারপূর্ণ উৎফুল্ল হওয়া এবং গর্ব করা, এগুলো সাধারণত কাফিরদের বৈশিষ্ট্য, মু’মিনদের নয়, [ফাতহুল কাদীর ২/৫৫১, ইবন ‘আশূর, আত্-তাহরীর ওয়াত- তানভীর ১২/১২]।

মহান আল্লাহর বাণী, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ‘তখন সে অবশ্যই বলবে, আমার খারাপ বিষয়গুলো দুর হয়ে গেছে। আর সে তো তখন উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়’। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর বান্দাকে তার দুঃখ-কষ্ট, অসুস্থতা, ভয়-ভীতি এবং অভাব-অনটনের পর সুস্বাস্থ্য, শান্তি, স্বচ্ছলতা ইত্যাদি নে‘য়মাত দ্বারা পুরস্কৃত করেন, তখন তারা এর উপযোগী আল্লাহ তা‘আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না বরং বলে, আমার যাবতীয় বিপদাপদ; ভয়-ভীতি, দুঃখ-কষ্ট, দরিদ্রতা ইত্যাদি দুর হয়ে গেছে। আল্লাহর শুকরিয়া এবং তাঁর নি‘য়ামাতের প্রশংসা ছাড়াই সব কিছুর প্রভাব মিটে গেছে। আর কোন অসুবিধা নেই। তারা তখন অহমিকা নিয়ে বাড়তি উৎফুল্ল প্রদর্শন করে এবং মানুষদের সাথে বাড়াবাড়ি আচরণ ও অহংকারপূর্ণ আনন্দে মেতে উঠে, [তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৩০৯, আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর ২/৫৫১, আত্-তাহরীর ওয়াত তানভীর ১২/১৪]। এ আয়াতগুলোতে যেসব কথা বলা হয়েছে আল-কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এরূপ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, [আশ্ শান্কীতি, আদওয়াউল বায়ান ৩/১৮২, আত তাহরীর ওয়াত তানভীর ১২/১৪]।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

‘আর মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ডাকে। আর যখন তার দুঃখ, মুসীবত দুর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলে যেন তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর সে আমাদেরকে ডাকেইনি। এভাবেই সীমালংঘনকারীদের জন্য তারা যে কাজ করেছে, তা সুসজ্জিত করে দেয়া হয়েছে’ [ইউনুস- ১০: ১২]।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا}

‘আর আমরা যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দুরে সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে’, [বানু ইসরাঈল- ১৭: ৮৩]। অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ}

‘আর মানুষকে যখন দুঃখ দুর্দশা স্পর্শ করে তখন তারা তাদের রবকে তাঁরই দিকে একনিষ্ঠ হয়ে ডাকে। তারপর তিনি যখন তাদেরকে তাঁর রাহমাত আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের রবের সাথে শিরক করে’, [আর- রূম- ৩০: ৩৩, আর দেখুন: ৩৬]। আল্লাহ সুবাহনাহু আরো বলেন,

{وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ}

‘আর মানুষকে যখন দুঃখ-মুসীবত স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠ হয়ে তার রবকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ভুলে যায় তার আগে যার জন্য সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ স্থাপন করে অন্যকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলুন, তুমি কিছুকাল কুফরীর জীবন উপভোগ কর। নিশ্চয় তুমি আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে শামিল আছ’, [আয্- যুমার- ৩৯: ৮, ৪৯]। আল্লাহ সুবাহনাহু বলেন,

{لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ}

‘মানুষ কল্যাণ কামনায় কোন ক্লান্ত হয় না। কিন্তু যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে

তখন সে প্রচণ্ডভাবে হতাশ ও নিরাশ হয়। আর যদি দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর আমরা তাকে আমার পক্ষ থেকে রাহমাতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন সে অবশ্যই বলে, এ আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে। আর যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তবুও তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। অতএব, আমরা অবশ্যই কাফিরদেরকে তাদের আমল সম্বন্ধে অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাব। আর যখন আমরা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দুরে সরে যায়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনাকারী হয়’, [সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ, ৪১: ৪৯-৫১]। অর্থাৎ একজন অবাধ্য মানুষ নিজেদের পার্থিব কল্যাণ; সুখ, শান্তি, ধন-সম্পদ ও সুস্বাস্থ্য, পদ- পদবী ইত্যাদি কামনা করতে কখনো ক্লান্ত হয় না। এরই মধ্যে যখন তাকে দুঃখ-কষ্ট, দরিদ্রতা, বিপদ-আপদ ইত্যাদি স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে। আবার তার দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হওয়ার পর পুনরায় সচ্ছল অবস্থা ও পার্থিব স্বার্থ ভাগ্যে জোটে তখন সে বলে, এটা আমার প্রাপ্য, আমার কর্মেরই ফল। আমার মনে হয় না আমাকে পুনরায় পরকালে উঠতে হবে। যদি উঠতেও হয় তাহলে আমি অবশ্যই দুনিয়ার মতো সেখানে আমার রবের কাছে কল্যাণ লাভ করব। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ কাফিরদেরকে কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করাবেন, [তাফসীরুল বাগাভী ৭/১৭৮, ইবন কাসীর ৭/১৮৬, ফাতহুল কাদীর ৪/৫৯৮]।

একজন অবাধ্য মানুষ নিজেদের পার্থিব কল্যাণ; সুখ, শান্তি, ধন-সম্পদ ও সুস্বাস্থ্য, পদ- পদবী ইত্যাদি কামনা করতে কখনো ক্লান্ত হয় না। এরই মধ্যে যখন তাকে দুঃখ-কষ্ট, দরিদ্রতা, বিপদ-আপদ ইত্যাদি স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে। আবার তার দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হওয়ার পর পুনরায় সচ্ছল অবস্থা ও পার্থিব স্বার্থ ভাগ্যে জোটে তখন সে বলে, এটা আমার প্রাপ্য, আমার কর্মেরই ফল।

এভাবেই বানু আদম আল্লাহর নি‘য়ামাতকে অস্বীকার করে। তারা যখন খাদ্য গ্রহণ

করে, তখন মহান মবিবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আবার পান করে তাও স্বীকার করে না। তাকে প্রচুর দান করা হয় তারও প্রশংসা ও স্তুতি করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। আবু উমামা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ: لاَ يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا، أَوْ قَالَ ثَلاَثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ, هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

আমার রব আমার কাছে মাক্কার প্রশস্থস্থান ভর্তি স্বর্ণ উপস্থাপন করেছেন। আমি বলেছি, হে আমার রব! না, বরং আমি একদিন পেট ভরে খাব আরেক দিন ক্ষুধার্ত থাকব, অথবা তিনবার বা এ রকম বলেছেন যে, আমি যদি ক্ষুধার্ত থাকি তাহলে তোমার কাছে প্রার্থনা করব এবং তোমাকে স্মরণ করব। আর যদি উদরভর্তি থাকি তাহলে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব এবং তোমার প্রশংসা করব’, [সুনানুত্ তিরমিযী ৪/১৫৩, নং ২৩৪৭, তিনি হাদীসটি হাসান বলেছেন]।

আল্লাহর নি‘য়ামতের অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকার করার বহিঃপ্রকাশ অনেকভাবে হয়। উল্লেখযোগ্য কতিপয় রূপ নিম্নে তুলে ধরা হল;

এক. আল্লাহর কুরআন থেকে বিমুখ হওয়া : মানুষের প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে তাঁর কিতাব আল-কুরআন। এতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ, হিদায়াত এবং জীবনের আলো। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

‘নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এক আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে তাঁর অনুমতিক্রমে অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে যান। আর তাদের সরল পথের দিকে পথ দেখান’ [সূরা আল মায়িদাহ, ৫ : ১৫-১৬]। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আল কুরআন উভয়ই ‘নূর’ যা আল্লাহ সুবহানাহুর ওহী। বাস্তবিক অর্থে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী যা রাসূলুল্লাহর প্রতি নাযিল হয়েছে এজন্যে রাসূল হিসেবে তিনি, আল কুরআন এবং ইসলাম সবই নূর। এই নূর দ্বারা মানুষদেরকে অন্ধকারের পথ থেকে বের করে হিদায়াত তথা আলোর পথে এবং সরল পথে নিয়ে আসা হয়। এই নূর তথা ইসলাম ছাড়া আর অন্য বিধান আল্লাহর নিকট কখনো গ্রহণযোগ্য নয়, [ইবন জারীর, আত্-তাবারী ১০/১৪৫, তাফসীরুল কুরতুবী ১২/২৫৭]। সুতরাং যারা আল্লাহর কুরআনকে পাশ কাটিয়ে চলবে, পেছনে ফেলে রাখবে এবং পরিত্যাগ করবে তারা বস্তুতঃ আল্লাহর

নি'য়ামাত ও অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করে। একইভাবে যারা আল্লাহর কিতাবের বিরোধিতা করে এবং এর বিধি-বিধান ও চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষা পরিত্যাগ করে, তারা আল্লাহর নি'য়ামাতকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তির হুঁসিয়ারী দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ}

'আর কাফিরগণ বলে, তোমরা এই কুরআন শোন না এবং তাতে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। অতএব আমরা অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কর্মকান্ডের প্রতিদান দেব। আগুন, এটিই হলো আল্লাহর দুশমনদের প্রতিদান; সেখানে তাদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান রয়েছে। আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের অস্বীকৃতির প্রতিদান স্বরূপ', [সূরা হামীম আস্ সাজদাহ, ৪১, ২৬-২৮]।

দুই. সীরাতে মুস্তাকীম (সরল পথ) পরিহার করা : মানুষকে সরল পথ দেখানো আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ, যার কোন বিনিময় মূল্য হয় না। এই নি'য়ামাত থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরাশ হয়েছে। এই সরল পথই হচ্ছে পরিপূর্ণ 'ইসলাম'। সুতরাং যারা ইসলাম থেকে সরে যায় তারা আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করে এবং তাঁর দয়া, অনুকম্পা ও রাহমাত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। আর নিজের জন্য ধ্বংস, ভ্রষ্টতা ও ক্ষতির পথ বেছে নেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ}

'এরাই তারা, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। অতএব তাদের বানিজ্য লাভজনক হয়নি। আর তারা হিদায়াতপ্রাপ্তও হবে না', [সূরা আল বাকারাহ, ২ : ১৬]।

তিন. আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁকে মেনে চলার ক্ষেত্রে উদাসীনতা : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দ্বারা পৃথিবীর আবাদ করেছেন এবং তার জীবনের জন্য সব কিছুকে তার নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছেন। যাতে তারা যে জন্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা হক আদায় করে পালন করতে পারে এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তার অধিনস্থ সব নি'য়ামাতকে ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহ বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}

'আর আমি জিন ও মানুষকে তো এ জন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা কেবল আমার 'ইবাদাত করবে', [সূরা আয্ যারিয়াত, ৫১ : ৫৬]।

এ আয়াতের দাবী অনুযায়ী মানুষ কি আল্লাহর সকল নি'য়ামাতকে তাঁর আনুগত্য ও

‘ইবাদাতের জন্য কাজে লাগায়? আমাদের নিজেদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ বিনা আবেদনেই আমাদেরকে দিয়েছেন, এর কি আমরা যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি? অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কি আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের কাজে ব্যবহার করি?

চার. আল্লাহর নি‘য়ামাতকে তাঁর অবাধ্যতার কাজে লাগানো : মানুষ আল্লাহর কত নি‘য়ামাতকে অস্বীকার করে, শুধু তাই নয়, বরং এসব নি‘য়ামাতকে কুফরী, যুলম-নির্যাতন, পাপাচার এবং সীমালংঘণমূলক কাজে ব্যবহার করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ}

‘আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আল্লাহর অনুগ্রহকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের ঘরে (জাহান্নামে) নামিয়ে আনে, যার মধ্যে তারা দগ্ধ হবে, আর এ আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট! আর তারা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করে তাঁর পথ থেকে (লোকদেরকে) বিভ্রান্ত করার জন্য। আপনি বলুন! ভোগ করে নাও, বস্তুতঃ জাহান্নামের দিকেই তোমাদের প্রত্যবর্তন স্থান’। [সূরা ইবরাহীম, ১৪, ২৮-৩০]। কত মানুষকেই তো দেখা যায় যে, তারা ধন-সম্পদ, পদ-পদবী ও প্রভাবকে মানুষের উপর যুলম-নিপীড়ন, লাঞ্ছিত ও সীমালংঘন এবং অন্যের অধিকার হরণ করার কাজে ব্যয় করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى. أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى}

‘বাস্তবেই, নিশ্চয় মানুষ সীমালংঘনই করে থাকে; কারণ সে নিজকে অমুখাপেক্ষী মনে করে’, [সূরা আল ‘আলাক, ৯৬ : ৬-৭]। অর্থাৎ দুনিয়াতে তার চাহিদা মত ধন-সম্পদ, মান- সম্মান, প্রভাব- প্রতিপত্তি ইত্যাদি পেয়েছে। তখন এটা দেখে সে কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বরং অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে এবং মানুষের উপর যুলম-নির্যাতন ও তাদের অধিকার হরণের কাজে লেগে যায়, [শাইখ আস-সা‘দী, তাইসীরুল কারীম, পৃ. ৮৬০]। আবার কত মানুষ আছে, যারা তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনাকে ধোকা- প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তের কাজে লাগায়। মানুষদেরকে সত্য-ন্যায় ও হিদায়াতের পথ থেকে দুরে রাখার চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ}

‘তারা আল্লাহ ও মু’মিনদেরকে প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতিারিত করছে, অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না’, [সূরা আল বাকারা, ২ : ৯]।

পাঁচ. অনুগ্রহকারীর আল্লাহকে অস্বীকার করা ও তাঁকে মান্য না করা: মহান আল্লাহর

নি'য়ামাতের অস্বীকার করার আরেকটি কারণ হচ্ছে, নি'য়ামাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হওয়া। কেননা সে তখন মনে করে যে, আমার এসব প্রাপ্তি ও অর্জন আমার শক্তি-সামর্থ, উদ্যম, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল ইত্যাদির কারণে অর্জিত হয়েছে। সে ভুলে যায় যে, তার মহান সৃষ্টিকর্তা ও রিযকদাতা তার প্রতি অনুগ্রহ করেই এসবের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সে তা স্বীকার করে না, অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং এর হকও আদায় করে না। আল্লাহ সুবহানাহু অহংকারী এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকারকারী কারূনের চরম পরিণতির কথা আল-কুরআনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ}

'নিশ্চয় কারূন মূসার কাওমের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল। আর আমরা তাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ করুন! যখন তার কাওম তাকে বলেছিল, অহংকার করো না, নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারকারীদেরকে পছন্দ করেন না', [সূরা আল কাসাস, ২৮ : ৭৬]। কারূন পর্যাপ্ত সম্পদ ও ধণভাণ্ডারের মালিক হয়ে কৃতজ্ঞ না হয়ে অহংকারী হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ}

'সে বলল, এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে পেয়েছি। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার আগে অনেক জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল এবং জনসংখ্যায় অধিক ছিল? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না'? [সূরা আল কাসাস, ২৮ : ৭৮]। অর্থাৎ কারূনের সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো যে, তুমি ঔদ্ধত্য আচরণ ও অহংকার করো না, তখন সে বলতে থাকে যে, আমার বিপুল ধন-সম্পদ তো আমার নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা বলে অর্জিত হয়েছে। অথবা সে বলে, আল্লাহ আমাকে এসব ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার যোগ্য মনে করেছেন, এবং আমাকে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, তাই আমি পেয়েছি, [তাফসীর ইবন কাসীর ৬/২৫৪]। অতঃপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে করুণ পরিণতির সম্মুখীন করেন। আল্লাহ বলেন,

{فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ}

'অতঃপর আমরা কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে তাকে সাহায্য করে এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না', [সূরা আল কাসাস, ২৮ : ৮১]। এভাবে

কারূন আল্লাহর বিশাল নি‘য়ামাত লাভের পর তার অহংকার ও আল্লাহ তা‘আলার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের দরুণ তা ধ্বংস হয়ে যায়।

অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহর নি‘য়ামাত ধ্বংস হয়, আল্লাহর নি‘য়ামাতের কৃতজ্ঞতা যথযথভাবে প্রকাশ করা অপরিহার্য। অন্যথায় তা স্থায়ী হয় না, ধ্বংস হয়ে যায়। এমন অনেক বাস্তব ঘটনা আছে যে, নি‘য়ামাতের অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেছেন। তাদের ক্ষমতা, সম্পদ ও ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ}

‘আর আল্লাহ এক জনপদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সবদিকে থেকে পর্যাপ্ত রিযক ও জীবনোপকরণ আসত। তারপর সে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে তারা যা করত সে জন্য আল্লাহ সেটাকে ক্ষুধা ও ভীতির দ্বারা আচ্ছন্ন করার স্বাদ আস্বাদন করালেন’, [সূরা আন্ নাহল, ১৬: ১১২]। অর্থাৎ তাদের অকৃতজ্ঞতার শাস্তি স্বরূপ তাদের ভয়-ভাতি, ক্ষুধা-দারিদ্র চারদিক থেকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। এই জনপদ বলতে অধিকাংশ মুফাসসির মাক্কা মুকাররমা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান গ্রহণ না করার কারণে তাদের প্রতি ইউসুফ (‘আ) সময়ের দুর্ভিক্ষের মত সাত বছরের দুর্ভিক্ষের বদ দু‘আ করেছিলেন, [সাহীহুল বুখারী, নং ৪৮২১, সাহীহ মুসলিম, নং ২৭৯৮, আর দেখুন: তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৬০৭- ৬০৮, ফাতহুল কাদীর ৩/২৩৮, আদওয়াউল বায়ান ২/৪৫৫]। মহান আল্লাহ অন্য একটি জাতি সম্পর্কে বলেন যে, তারা বাগানের অধিকারী ছিল, যারা ষড়যন্ত্র করেছিল এবং অভাবী ও দুঃস্থ মানুষদেরকে তাদের অধিকার ও প্রাপ্য, যা তারা তাদের পিতার কাছ হতে তার মৃত্যুর পূর্বেই গ্রহণ করত, তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ}

‘আমরা তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা ভোর বেলায় বাগানের ফল আহরণ করবে। আর তারা ইনশা আল্লাহ বলেনি। অতঃপর আপনার রবের কাছ থেকে এক বিপর্যয় সে বাগানে হানা দিল, যখন তারা ঘুমন্ত ছিল। ফলে তা পুড়ে গিয়ে কালবর্ণ ধারণ করল। সকাল বেলায় তারা একে অপরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি

ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল তোমাদের ক্ষেতে চল। তারপর তারা নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে চলল যে, আজ যেন তোমাদের কাছে কোন মিসকীন প্রবেশ করতে না পারে। আর তারা বাধা দিতে সক্ষম; এ ধারণা নিয়ে বাগানে যাত্রা করল। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা দেখতে পেল, তখন বলল, আমরা নিশ্চয় পথ হারিয়ে ফেলেছি। বরং আমরা তো বঞ্চিত হয়েছি', [সূরা আল কালাম, ৬৮ : ১৭-২৭]। অর্থাৎ বাগানের মালিকদেরকে প্রচুর ফলমূল দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তারা প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে গরীব, অভাবী মানুষদেরকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে রাতে ফল-ফলাদি সংগ্রহ করতো, যাতে অভাবী মানুষেদেরকে তা থেকে দিতে না হয়। তাদের এই অকৃতজ্ঞতার দরুণ আসমান থেকে বিপর্যয় নেমে আসল এবং তাদের বাগান ও ক্ষেত- খামার নষ্ট হয়ে গেল, [তাফসীর ইবন কাসীর ৮/১৯৫]। যদিও তারা পরবর্তীতে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করে এবং তাদের শাস্তিকে পুনরায় নি'য়ামাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়ার কামনা করে।

মহান আল্লাহর বাণী, {إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ} 'তবে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরই জন্য ক্ষমা ও বিশাল প্রতিদান রয়েছে'। আলোচ্য দরসের শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করে বলেছেন যে, মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে, তা হলো; ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং সৎকর্মশীলতা। এমন গুণের মানুষদের জন্য বিশাল প্রতিদান ও পুরস্কার আছে।

শিক্ষাসমূহ: এ আয়াতগুলোর অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি শিক্ষা তুলে ধরা হলো:

এক. সুখের পরে দুঃখ এবং দুঃখের পরে সুখ, এটি অনেকটাই সাধারণ নিয়ম। তাই কোন এক অবস্থায় থাকলে অন্য অবস্থার জন্য তৈরী থাকা বাঞ্ছনীয়।

দুই. ভাল ও স্বচ্ছন্দ অবস্থায় থাকলে তখন আল্লাহর যথাযথ কৃতজ্ঞতা কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। তাহলে তা কল্যাণকর হবে, বৃদ্ধি হবে ও স্থায়ী হবে।

তিন. সুখের পর দুঃখ ও মুসীবতে পড়লে কোনভাবেই অস্থির হওয়া উচিত নয় বরং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে গ্রহণ করা এবং তা দুর করার জন্য আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেয়া জরুরী। এ ধৈর্য ধারণ ব্যক্তির জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের জন্য কল্যাণকর।

চার. ধৈর্য ও তাকওয়ার গুণ দ্বারা মু'মিনগণ সব ধরনের বিপদ- আপদ, বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্রসহ সককিছুর উপর বিজয় অর্জন করতে পারে। এ ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ও বিশ্বাস থাকা বাঞ্ছনীয়।

দয়ালু আল্লাহ আমাদেরকে 'আমল করার তাওফীক দান করুন!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

১৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধনীতি

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

[শেষাংশ]

এ জিহাদ ৪ ধরনের :

এক. নফ্‌সকে হিদায়াত ও দ্বীনে হক এর শিক্ষাদানের জিহাদ বা প্রচেষ্টা। কারণ এটা ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ও সৌভাগ্য লাভ সম্ভব নয়। এটি করতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই ভাগ্যহত হতে হবে।

দুই. দ্বীনের 'ইলম বা জ্ঞান অর্জনের পর তার প্রতি 'আমলের জন্য জিহাদ বা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্যথায় 'আমল বিহীন 'ইলম কোন উপকারে আসবেনা, যদিও তা ক্ষতিকর নয়।

তিন. যে ব্যক্তি দ্বীন ও হিদায়াত সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে ব্যক্তিকে তার দা'ওয়াত দানের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। নতুবা আল্লাহর অবতীর্ণ হিদায়াত ও নিদর্শনাবলীকে যারা গোপন করে তাদের মধ্যে শামিল হবে। আর তার 'ইলম কোন উপকারে আসবেনা এবং তা তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে নাজাতও দেবেনা।

চার. আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে যে বিরোধিতা এবং কষ্টের সম্মুখীন হয়, তার উপর ধৈর্য ধারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আর এগুলো সহ্য করবে শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য।

এ চারটি ধাপ পূর্ণ করতে পারলে তিনি রাব্বানী বা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাবেন। কেননা পূর্ববর্তীগণ এ ব্যাপারে একমত যে 'আলিম (জ্ঞানী ব্যক্তি) রাব্বানী নামের যোগ্য হবেনা, যতক্ষণ না সত্য অবগত হয়, তার প্রতি 'আমল করে এবং তার শিক্ষাদান করে। যিনি জানেন, শিক্ষাদান করেন এবং 'আমল করেন, তাকে আকাশরাজ্যে মর্যাদাশালী হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১]

শয়তানের সাথে জিহাদ :

এ জিহাদ দু'ধরনের।

(ক) ঈমানের ক্ষেত্রে শয়তান যে সকল সুক্ষ্ম সন্দেহ ও সংশয়সমূহের উদ্রেক করে, তা দুরিভূত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

(খ) শয়তান যে সকল প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির দাবী পেশ করে, তা প্রতিহত করার জন্য জিহাদ করা। ইবনুল কায়্যিমের মতে শয়তানের সাথে এ দ্বিবিধ জিহাদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়) ও সবর (ধৈর্যশীলতা) তৈরী হয় এবং ইয়াকীন ও

---

[১] প্রাগুক্ত।

সবরের দ্বারাই দ্বীনের নেতৃত্ব লাভ হয়ে থাকে। তিনি বলেন, ‘‘প্রথমোক্ত জিহাদের পর ইয়াকীন সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয়টির পর সৃষ্টি হয় সবরের। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

‘‘আমি তাদের মধ্য থেকে ঐ লোকদেরকে নেতৃত্ব দান করি, যারা আমার নির্দেশনায় পথ চলে, যখন তারা ধৈর্যধারণ করে এবং আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়।’’ (৩২, সূরা আস্‌সাজদা : ২৪)

এখানে আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, দ্বীনের নেতৃত্ব সবর ও ইয়াকীনের দ্বারা লাভ হয়। সবর প্রবৃত্তির চাহিদা ও ইচ্ছাসমূহকে বিদূরিত করে। অপরদিকে ইয়াকীন সন্দেহ ও সংশয়সমূহকে দূরিভূত করে দেয়।[২]

কাফির ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ

এ দু‘শ্রেণীর সাথে জিহাদের ৪টি স্তর ভাগ রয়েছে। (১) অন্ত:করণ দ্বারা জিহাদ করা (২) যবান বা কথার দ্বারা জিহাদ করা (৩) ধন-সম্পদের দ্বারা জিহাদ করা এবং (৪) জীবন (অর্থাৎ নিজের শক্তি সামর্থ ও সময়ের) দ্বারা জিহাদ করা।

হাতের দ্বারা অর্থাৎ শক্তির প্রয়োগ করে যুদ্ধ কাফিরদের সাথে অধিকতর প্রযোজ্য। আর কথার দ্বারা জিহাদ মুনাফিক‘দের সাথে অধিকতর মানানসই।[৩]

অত্যাচারী, বিদ্‘আতী ও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জিহাদ

এ জিহাদও তিনটি স্তরে বিন্যস্ত :

১। সামর্থ থাকলে জালিম, ফাসিক, ফাজির ও বিদ্‘আতপন্থীদের সাথে হাতের দ্বারা অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে জিহাদ করতে হবে।

২। শক্তি প্রয়োগে জিহাদ করতে অসমর্থ হলে কথার দ্বারা জিহাদ করতে হবে।

৩। তাতেও অসমর্থ হলে কল্‌ব বা অন্ত:করণের দ্বারা জিহাদ করতে হবে।[৪]

ইবনুল কায়্যিম জিহাদের উপরোল্লিখিত ১৩টি স্তরভাগের বিবরণ দিয়েছেন।

অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা বা তা প্রতিহত করার চেষ্টা বা পরিকল্পনা না করা ঈমানদারীর লক্ষণ নয় এবং জিহাদে অংশ গ্রহণে অনিহা প্রদর্শন মুনাফিকির লক্ষণ বিশেষ। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»

---

[২] প্রাগুক্ত খ. ২, পৃ. ৩৯-৪০।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।

[৪] জিহাদের তিনটির স্তরের বর্ণনা হাদীছ থেকেও জানা যায়। রাসূল (সা.) বলেন, من رأى منكم منكرا فليغره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان ‘‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ প্রত্যক্ষ করে সে যেন তা হাত (শক্তি) দ্বারা প্রতিহত করে। যদি তাতে সমর্থ না হয় তাহলে যেন কথার দ্বারা প্রতিবাদ করে। তাতেও যদি সমর্থ না হয় তাহলে যেন অন্ত:করণ দ্বারা তা পরিবর্তনের চিন্তা করে। তবে এটা দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।’’ (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি কাউনিন্‌ নাহ্‌য়ি ‘আনিল মুনকারি মিনাল ঈমান, হাদীছ নং ৪৯)

‘‘যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে অথচ যুদ্ধ করেনি অথবা যুদ্ধের সংকল্পও করেনি, সে ব্যক্তি মুনাফিকির কোন শাখার উপরই মৃত্যুবরণ করে।”[৫]

ঈমান, হিজরত ও জিহাদ

ইবনুল কায়্যিমের মতে জিহাদ ও হিজরত একটি আরেকটির সম্পূরক। তাঁর মতে হিজরত ছাড়া জিহাদ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অনুরূপভাবে এ উভয়টি আবার ঈমানের সম্পূরক। সুতরাং হিজরাত এবং জিহাদ ঈমান ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনা। তিনি বলেন, যারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, তাদের জন্য ঈমান, হিজরত ও জিহাদ - এ তিনটির উপর সুদৃঢ় থাকা জরুরী। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘‘নিশ্চই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করতে পারে। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল ও করুণাময়।” (২, সূরা আল্‌বাকারা : ২১৮)

ইবনুল কায়্যিমের মতে প্রত্যেকের উপর ঈমান যেমন ফরজ, অনুরূপভাবে তার উপর প্রতিটি মুর্হূতে দু’টি হিজরত ফরজ। প্রথমত: আল্লাহর দিকে হিজরত করা। আর এ হিজরত করতে হবে তাওহীদ (একত্ববাদ), ইখলাস (ঐকান্তিকতা), তাঁর দিকে ফিরে আসা, তাওয়াক্কুল, ভীতি, আশা এবং ভালবাসা ও তাওবার মাধ্যমে।[৬]

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর রাসূলের দিকে হিজরত করা। আর এ হিজরত করতে হবে আনুগত্য, তাঁর নির্দেশকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া, তাঁর সংবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করা এবং তাঁর নির্দেশ ও সংবাদকে অন্য সকল নির্দেশ ও সংবাদের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে।

যার হিজরত নিছক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে হবে, কেবল সেটিই আল্লাহ ও রাসূলের দিকে হিজরত বলে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে যার হিজরত হবে দুনিয়া প্রাপ্তির বা কোন স্ত্রী লোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যে বলেই পরিগণিত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।[৭]

তাঁর মতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নফস্ (প্রবৃত্তি) ও শয়তানের সাথে জিহাদ করা ফরজ। আর এটি সবার উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ (ফরজে ‘আইন)। এ জিহাদ একজন করলে অন্যজনের পক্ষ থেকে আদায় হবে না। কিন্তু কাফির এবং মুনাফিক্দের বিরুদ্ধে জিহাদ উম্মাহর একটি অংশ করলেই যথেষ্ট হবে, যদি তাদের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়।[৮]

---

[৫] মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাবু জাম্মি মাম মাতা ওয়া লাম ইয়াগ্যু ওয়া লাম ইউহাদ্দিছ নাফসাহু বিল গায্‌য়ি, হাদীছ নং ১৯১০।

[৬] ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত।

[৭] বুখারী, হাদীছ নং ১।

[৮] ইবনুল কায়্যিম।

উপরে বর্ণিত জিহাদের স্তরভাগের ক্ষেত্রে কমবেশীর কারণেই আল্লাহর নিকট কোন ব্যক্তির মর্যাদার তারতম্য হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি যত বেশী স্তরে জিহাদ করতে সক্ষম, আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা তত বেশী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যত কম সংখ্যক স্তরে জিহাদ করে, তার মর্যাদাও তত কম হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে ইবনু কায়্যিম বলেন, ‘‘আল্লাহর কিনট সবচেয়ে পরিপূর্ণ সৃষ্টি হলো সেই ব্যক্তি, যিনি জিহাদের সকল স্তর পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লার নিকট সৃষ্টির মর্যাদার তারতম্য হয়ে থাকে জিহাদের স্তরের তারতম্যের কারণে।”[৯]

আল্লাহর পথে জিহাদের ক্রমধারা ও প্রায়োগিক স্তরভাগ

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। কুরআনের বহুস্থানে বিভিন্নভাবে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলিমদের শান শওকত ও মান মর্যাদা সুরক্ষা এবং জু্লুম-শোষণ ও নিপীড়ন নির্যাতন থেকে মানবতাকে মুক্তি দান এর অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু এটিকে যথাস্থানে ব্যবহার করার উপরই এর কল্যাণকারিতা নির্ভরশীল। স্থান কাল পাত্রভেদে এর সঠিক ব্যহারের পরিবর্তে যত্র-তত্র, যখন-তখন এর ব্যবহার কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ এবং শান্তি ও শৃংখলার পরিবর্তে অশান্তি ও ফিত্না-ফাসাদের বিস্তার ঘটার সম্ভবনা রয়েছে। অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতন দূরিকরণে জিহাদের সুফল পেতে হলে এর ক্রমবিকাশ, ক্রমধারা, প্রায়োগিক স্তরবিন্যাস এবং প্রয়োগ পদ্ধতি ও ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। ‘আল্লামা ইবনুল কায়্যিম এ ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনুল কায়্যিম জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ক্রমধারাকেই এর প্রায়োগিক ক্রমধারা ও স্তরভাগ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত নিম্নে বিবৃত হল:

তিনি বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা রাসূল (সা.) এর উপর প্রথম যে ওহী অবতীর্ণ করেন, তাহলো

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

‘পড় তোমার প্রভূর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।’ (৯৬, সূরা আল্‌‘আলাক : ১)

এটাই ছিল তাঁর নবুওয়্যাতের সূচনা। আল্লাহ তা‘আলা এ ওহী তাকে নিজে নিজে পাঠ করার আদেশ দেন, কিন্তু অন্যের নিকট তা প্রচারের নির্দেশ দেননি। অত:পর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উপর অবতীর্ণ করেন,

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – قُمْ فَأَنْذِرْ

‘হে চাঁদর আবৃত ব্যক্তি, উঠ এবং (লোকদেরকে) সতর্ক কর।’ (৭৪, সূরা আল্‌মুদ্দাছ্‌ছির : ১-২) আল্লাহ তা‘আলা اقرأ এর মাধ্যমে তাঁকে নবুওয়্যাত এবং يَا أَيُّهَا

---

[৯] ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত।

الْمُدَّثِّرُ এর মাধ্যমে তাঁকে রিসালাত দান করেন। অত:পর আল্লাহ তাঁকে নিকটবর্তী আত্মীয়দেরকে সাবধান করার নির্দেশ দেন। এরপর স্বীয় সম্প্রাদায়, তারপর পার্শ্ববর্তী ‘আরববাসী, তৎপর সমগ্র ‘আরব জাহান এবং সর্বশেষ সারা জাহানের লোকদেরকে সতর্ক করার নির্দেশ দেন। নবুওয়্যাত লাভের পর দীর্ঘ ১৩ বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং জিযিয়া ব্যতীত শুধুমাত্র দা‘ওয়াতের মধ্যমে তিনি তাদেরকে সতর্ক করতে থাকেন। এ পর্যায়ে তাকে ধৈর্য, সহ্য ও হস্ত গুটিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। অত:পর আল্লাহ তাঁকে (মদীনায়) হিজরতের অনুমতি দেন এবং যুদ্ধেরও অনুমতি দেন। অতপর যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয় এবং যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে, তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। জিহাদের এ নির্দেশের পর কাফিররা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পরে। এক. চুক্তিবদ্ধ, দুই. যুদ্ধরত, তিন. জিম্মি।

সন্ধি ও চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় যতক্ষণ চুক্তি বলবৎ রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সংগে চুক্তি পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের কারো পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা থাকলে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিতে বলা হয় এবং প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে অবগত না করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়। পক্ষান্তরে যারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

সন্ধি ও চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় যতক্ষণ চুক্তি বলবৎ রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সংগে চুক্তি পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের কারো পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা থাকলে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিতে বলা হয় এবং প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে অবগত না করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়। পক্ষান্তরে যারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। অত:পর এতদ্‌সংক্রান্ত বিধান সম্বলিত সূরা তাওবা নাযিল হয় এবং তাতে আহলি কিতাবদের মধ্যে যারা নবীর দুশমন, তাদের সাথে জিযিয়া প্রদান অথবা ইসলামে দাখিল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। অনুরূপভাবে উক্ত সুরায় কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দয়া হয় এবং তাদের প্রতি কঠোর হওয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাসূল

(সা.) কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারী ও সমরাস্ত্র দ্বারা এবং মোনাফিকদের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক ও কথার দ্বারা জিহাদ করেন।

এ সূরাতে নবী (সা.)কে কাফিরদের চুক্তিসমূহ থেকে মুক্ত হওয়ার এবং সেগুলোকে তাদের দিকে নিক্ষেপ করার (প্রত্যাহার করার) নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়সমূহ তিন শ্রেণিতে পরিণত হয় :

এক. যারা চুক্তি বহাল না রেখে তা ভঙ্গ করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয় এবং রাসূল (সা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হন।

দুই. যাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি ছিল। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং রাসূলের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। তাদের সাথে মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

তিন. যাদের সাথে কোন চুক্তি ছিল না এবং যারা তাঁর সাথে যুদ্ধও করেনি, অথবা যাদের সাথে অনির্দিষ্টকালের জন্য চুক্তি ছিল, তাদেরকে চার মাসের সময় দেয়া হয়। চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ জারী করা হয়। এ চার মাস মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর চুক্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাভূত করেন। যাদের সাথে কোন চুক্তি ছিল না অথবা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি ছিল, তাদেরকে চার মাসের সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। আর যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি ছিল তাদের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে মেয়াদ শেষ হওয়ার পুর্বেই এরা সকলেই কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে। যারা জিম্মী ছিল, আল্লাহর রাসূল তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করেন।

এভাবে সূরা তাওবা নাযিলের পর কাফিররা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পরে। ১. রাসূলের সাথে যুদ্ধরত দল। ২. চুক্তিবদ্ধ দল। ৩. জিম্মী। চুক্তিবদ্ধ ও সন্ধিকারী দল ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে কাফিররা যুদ্ধরত ও জিম্মি- এ দু'দলে বিভক্ত হয়। যুদ্ধরত দলগুলো সর্বদা আল্লাহর নবীকে ভয় করত। সর্বশেষ সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। (ক) নবীর প্রতি ঈমান আনয়ণকারী মুসলিমগণ (খ) নিরাপত্তালাভকারী জিম্মিগণ এবং (গ) যুদ্ধরত কাফিরগণ। এখন থাকল মুনাফিকগণ। আল্লাহ তাদের প্রকাশ্য অবস্থা মেনে নিয়ে অন্তরের কপটতাকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং জ্ঞান ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাদের সাথে জিহাদের নির্দেশ দেন। তাদের ব্যাপারে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন, তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন, বলিষ্ঠ বক্তব্যের মাধ্যমে তাদেরকে সংশোনের চেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন এবং তাদের জানাযার সালাত আদায় করতে ও তাদের কবরের পার্শ্বে দন্ডায়মান হতে নিষেধ করেন এবং বলে দেন যে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। কাফির এবং মুনাফিক শত্রুদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রাসূলের অবলম্বিত নীতি।”[১০]

---

১০. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ৮১-৮২।

ইবনুল কায়্যিমের উল্লেখিত আলোচনা থেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন তথা জিহাদের ক্রমবিকাশ, ক্রমধারা ও স্তরভাগ সম্পর্কে সম্যক ধরণা পাওয়া যায়। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো :

১। সূচনা পর্ব ও ব্যক্তিগত প্রস্তুতির স্তর : এ স্তরে ওহী নাযিল শুরু হয়। তবে তা প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং রসূলকে তা ভালভাবে পাঠ করতে এবং বাক্তিগত জীবনে তা অনুশীলন করতে বলা হয়েছে। প্রথম নাযিলকৃত ওহী এবং প্রথম দিককার ওহীগুলোতে আমরা এর সাক্ষ্য পাই। যেমন

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ – خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ – اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ – الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ – عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

''পড় তোমার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক (আঠালো পিণ্ড) থেকে। পড়, আর তোমারা প্রভূ অতিশয় মর্যাদাবান, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন সে সব বিষয়, যা সে জানত না।''(৯৬, সূরা আল্'আলাক : ১-৫)

এ আয়াতগুলোতে রাসূল (সা.) কে আল্লাহর বাণী ভালভাবে পাঠ করে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা মুয্যাম্মিলে কুরআনকে অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও তা অনুশীলনের মাধ্যমে অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ – قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا – نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا – أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا – إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا – إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا – إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا – وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

''হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, অল্প কিছু অংশ বাদ দিয়ে রাত্রি জাগরণ কর। জাগরণ কর অর্ধরাত্রি অথবা তাঁর চেয়ে কিছু কম বা কিছু বেশী। আর কুরআন তিলাওয়াত কর অত্যন্ত ধীর–স্থিরভাবে। কারণ অতি শীঘ্রই আমি তোমার উপর অর্পণ করব এক কঠিন দায়িত্ব। আর স্মরণ কর তোমার প্রভূর নাম এবং তার সান্নিধ্যে একান্তে অভিনিবেশ কর।'' (৭৩, সূরা আল্মুয্যাম্মিল : ১-৮)

এ আয়াতগুলোতে আন্দোলনের নেতৃত্বদানকালে রাসূল (সা.) কে নিজের মধ্যে বিশেষ যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য আরামের বিছানা ছেড়ে রাত্রি জেগে সালাত আদায়, অভিনিবেশ এবং চিন্তা-গবেষণাসহ কুরআন অধ্যয়ন, আল্লাহকে স্মরণের মাধ্যমে তাঁর প্রকৃত পরিচয় অবগত হওয়া এবং নিভৃতে ঐকান্তিকতার সাথে তাঁর ধ্যানমগ্ন থেকে তাঁর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের জন্য কঠোর সাধনায় লিপ্ত হতে বলা হয়েছে। কারণ এ আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে দৈহিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও জ্ঞানগত যোগ্যতার প্রয়োজন, তা অর্জন করার প্রকৃষ্ট পন্থা এটাই। এ ভাবেই এ স্তরে রাসূলকে গুরুদায়িত্ব

পালনের যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

২। জনবল সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের স্তর : যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্য তার প্রচার, প্রসার এবং সে জন্য লোকবল সংগ্রহ ও উপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা। এ স্তরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) একান্ত নিজস্ব পরিসরে দা'ওয়াত দান এবং আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনকে এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা। এ স্তরে নাযিলকৃত আয়াতে বলা হয়েছে,

وَأَنذِرْعَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ

"তোমার নিকটত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।" (২৬, সূরা আশ শু'আরা: ২১৪)

(খ) নিজস্ব পরিসর পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক পরিসরে দা'ওয়াত দান। এ স্তরে নাযিলকৃত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – قُمْ فَأَنْذِرْ

'হে চাঁদর আবৃত ব্যক্তি, উঠ এবং (লোকদেরকে) সতর্ক কর।' (৭৪, সূরা আল্‌মুদ্দাছ্‌ছির : ১-২)

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"তোমার প্রতি যা আদেশ করা হয়েছে তা প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ।"(১৫, সূরা আল্‌হিজর: ৯৪)

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা:) ইসলামী দা'ওয়াত সম্প্রাসারণের উদ্যোগ নেন। এর ফলে দা'ওয়াত সম্প্রসারণের সাথে সাথে জনবল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে দা'ওয়াত গোটা 'আরব সমাজে ছড়িয়ে পরে।

এ পর্যায়ে রাসূল (সা:) দা'ওয়াত গ্রহণকারী লোকদেরকে সংঘদ্ধ করে 'আকীদা ও নৈতিক সংশোধনীর পাশাপাশি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন।

৩। বিরোধিতা ও নির্যাতনের স্তর : ইসলামী দা'ওয়াত সম্প্রসারণের ফলে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল কাফির-মুশরিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকে। মুসলিমদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ, বিরোধিতা ও নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও দা'ওয়াতী কাজের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকায় এক পর্যায়ে কাফির- মুশরিকরা মুসলিমদের প্রতি নিপীড়ন-নির্যাতন শুরু করে। সময়ের ব্যবধানে সে নির্যাতন কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। নির্যাতন চরম আকার ধারন করলে মক্কায় দা'ওয়াতী কাজ স্তিমিত হয়ে পরে এবং নব উত্থিত ইসলামী শক্তি এবং তার অনুরাসীদের জন্য মক্কা একেবারেই অনিরাপদ ও বিপজ্জনক হয়ে উঠে। ফলে মুসলিমগণ মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। মক্কী জীবনের তেরো বৎসরের মধ্যে প্রথম তিন বৎসর গোপনে দা'ওয়াতী কাজ করা হয়। প্রকাশ্য কাজ শুরুর পর প্রথম ২/৩ বৎসর তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু এরপর ইসলামী শক্তিকে বাধার

সম্মুখীন হতে হয়। এ সময়ে সাহাবীগণকে নির্মম নির্যাতন করা হয় এবং অনেককে শহীদ করা হয়। এমন কি প্রিয় জন্মভূমি ও বাসভূমি পরিত্যাগ করে তারা মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এতদ্‌সত্ত্বেও এ সময়ে প্রতিবাদ বা প্রতিশোধ গ্রহণের বা স্বশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح

‘আরবের মুশরিক ও ইহুদীরা একই ধনুক হতে (অর্থাৎ সম্মিলিত ভাবে) মুসলিমদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকে এবং তাদের জন্য শত্রুতা ও যুদ্ধের তরবারি শানিত করে তুলে এবং প্রতিটি প্রান্ত হতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হৈচে শুরু করে। এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মুসলিমদেরকে ধৈর্য্য, ক্ষমা ও উদারতা অবলম্বনের নির্দেশ দান করেন।”[১১]

মক্কী যুগে যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকার কারণ

মক্কী জীবনে যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকার ব্যাপারে সায়্যিদ কুতুব শহীদ তাঁর অমর গ্রন্থ “মা‘আলিম ফিত তারীক” গ্রন্থে যে সকল কারণ বর্ণনা করেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে তার সার সংক্ষেপ পেশ করা হলো :

(ক) রাসূল (সা:) বনী হাশিমের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশ্যভাবে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও ছোট ছোট আলোচনা সভার মাধ্যমে দ্বীনের বাণী প্রচার করে জনগণের মন-মগজে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ লাভ করেছিলেন। মক্কায় তখন কোন সুসংগঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাঁর প্রচারে অথবা জনগণের সাড়া প্রদানে বাধা সৃষ্টি করছিলনা। তাই ঐ স্তরে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

(খ) ঐ সময়ে ইসলামী আন্দোলন এক বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী বাহিনী তৈরী করছিল। কারণ তৎকালীন পরিবেশে যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান খুবই জরুরী ছিল। ‘আরবগণ যে সব বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল না, সে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা সহ্য করার মত মনোবল তৈরী করা ছিল একেবারেই অপরিহার্য। নিজের বা আত্মীয় স্বজনের উপর জুলুম হলে ধৈর্য্য ধারণ করা, আত্ম অহংকার ও আত্ম মর্যদাবোধকে নিয়ন্ত্রিত করা, ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটানো অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের আকাংখা দমন করা, আত্মপুজা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে নিবৃত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৎকালীন ‘আরবে ইসলাম গ্রহণকারীদের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কিত ধারণা পরিবর্তন করা প্রয়োজন ছিল। কারণ, জাহিলিয়াতের যুগে তাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নিজের ও স্বজনদের নিরাপত্তা বিধান। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের জীবনের লক্ষ্য

---

[১১] প্রাগুক্ত, খ. ২, প. ৫৮।

পরিবর্তিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন জরার জন্য তাদের তৈরী করে তোলা ছিল খুবই জরুরী। তারা যেন উত্তেজনার বসে রাগান্বিত হয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে না ফেলে। ববং অত্যন্ত ধীর ও স্থির মস্তিস্কে ভারসাম্যমূলক ও শালীনতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। একজন মহান নেতার আদেশে একটি সুশৃংখল সংগঠনের সদস্য হিসেবে কাজ করা এবং প্রতিটি বিষয়ে নেতার মতামত জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করার জন্যেও তাদেরকে ট্রেনিং দেয়া দরকার ছিল। নেতার আদেশ ব্যক্তি বিশেষের পছন্দ না হলেও শৃংখলা রক্ষার্থে তা মেনে চলার জন্য তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা হচ্ছিল। ‘আবরদের জীবন গড়ে তোলার জন্য এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণদান ছিল খুবই জরুরী। কারণ একটি সুশৃংখল, উন্নতস্বভাব, সুসভ্য ও পশু প্রবৃত্তিমুক্ত এবং গোত্রীয় বিবাদ-বিসম্বাদ বর্জিত সমাজ গড়ে তোলাই ছিল ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য।

(গ) মক্কী যুগে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশদানের পিছনে আরেকটি কারণ এই যে, কুরাইশগণ বংশ মর্যাদার অহংকারে লিপ্ত ছিল। তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে দ্বীনের পথে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা অধিকতরর কার্যকর ও ফলপ্রসু ছিল। লড়াই ও যুদ্ধ-বিগ্রহ অধিকতর শত্রুতা ও ক্রোধ বৃদ্ধির সহায়ক হতো এবং তাদের জন্মগত রক্ত পিপাসা আরও প্রবল হয়ে উঠতো। ইতোপূর্বে গোত্রীয় বিদ্বেষের ভিত্তিতে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চালানো হয়েছিল এবং ঐসব যুদ্ধে গোত্রের পর গোত্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম যদি ঐ ধরণের গোত্রীয় বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হতো, তাহলে তার আদর্শিক দা'ওয়াতী আবেদন কারো মনে সাড়া জাগাতে পারত না। বরং এক বিরামহীন রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের উপকরণ হয়ে থাকত মাত্র। আর সে অবস্থায় তার বাণী ও মৌলিক শিক্ষা গোত্রীয় বিবাদের তলায় নিষ্পেষিত হওয়ার আশংকা ছিল।

(ঘ) ব্যাপকভাবে গৃহযুদ্ধের বিস্তার রোধ করাও মক্কী যুগে যুদ্ধ পরিহার করে চলার অন্যতম কারণ ছিল। কেননা মুমিনদের উপর অত্যাচার করা ও তাদের আন্দোলনে বাধা দান করার জন্যে মক্কায় আইনানুগ কোন সরকার ছিল না। বরং প্রত্যেক মুসলিমের আত্মীয় স্বজন ও স্বগোত্রীয় লোকেরাই তাদের দা'ওয়াতের কাজে বাধা দিচ্ছিল এবং তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় যুদ্ধ করার অনুমতি দিলে প্রত্যেক পরিবারই এক একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হতো এবং এ ধারা অব্যাহত গতিতে চলতো। এতে বিরোধী মহল প্রচারণা চালানোর সুযোগ পেত যে, ইসলাম গৃহ বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়।

(ঙ) আল্লাহ অবগত ছিলেন যে, ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যারা তৎপর এবং মুসলিমদের প্রতি যারা নির্মম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে ঈমান আনয়ন করে ইসলামের একনিষ্ট সৈনিকে পরিণত হবেন। ‘উমর (রা.) তাদেরই একজন। একারণেও যুদ্ধ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

(চ) সে সময় মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং ইসলামী দা'ওয়াত তখনো মক্কার বাইরে প্রসার লাভ করেনি। কোন কোন এলাকায় এ সম্পর্কে মাত্র ভাসা ভাসা সংবাদ পৌঁছে। এ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হলে স্বল্প সংখ্যক মুসলিমদের জামা'আতটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। অসময়ে যুদ্ধ শুরু করার পরিণতি স্বরূপ তাঁদের সকলের জীবন নাশ হলে শিরক যথাস্থানে বিরাজমান থাকতো এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কখনো বাস্তবায়িত হতে পারতনা। কিন্তু ইসলাম যেহেতু দুনিয়াতে বাস্তবায়িত হওয়ার জন্যই এসেছে, সেহেতু যথা সময়ের পূর্বে যুদ্ধ শুরু করে দেয়া সঙ্গত ছিল না।[১২]

মক্কী স্তরে যুদ্ধ না করার নির্দেশ দান সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

فاقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغيرقتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبروالصفح

"নবুওয়্যাত লাভের পর তিনি ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করে জিযিয়া বা যুদ্ধ ছাড়াই দা'ওয়াতের মাধ্যমে লোকদেরকে সতর্ক করতে থাকেন। আর এ সময়ে তাঁকে হস্ত গুটিয়ে রাখা, ধৈর্যধারণ ও ক্ষমার নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়।"[১৩]

মদীনায় হিজরতের পরও প্রথমদিকে কিছু কাল (২য় হিজরীর রমজান মাসে বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত) যুদ্ধ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করা হয়,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে বলা হয়েছিল তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখ এবং সালাত কায়িম কর ও যাকাত প্রদান কর?" (৪, সূরা আন্নিসা : ৭৭)

মদিনায় প্রথম দিকে যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকার কারণ

মদিনায় প্রথম দিকে যুদ্ধ বন্ধ রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সুদূর মক্কা থেকে মুসলিমগণ মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় তারা ছিলেন নতুন এবং মদীনাও ছিল তাদের নিকট নতুন। এই নতুন অতিথিদের মদীনার নতুন পরিবেশ, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থান, লোকদের অবস্থান ইত্যাদি অবগত হওয়া এবং সেখানে থাকা-খাওয়াসহ বসবাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। নতুবা হিজরতের প্রথম চোটেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে মদীনায় তাদের অবস্থান সুসংহত হওয়ার সুযোগ পেতনা। ফলে মদীনায় তাদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পরত।

(খ) ইত:পূর্বে মদীনার যে সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের আমন্ত্রণেই মুসলিমগণ মদীনায় আগমন করেন। হিজরতকারী মুসলিমদের জন্য তাদের আশ্রয়-

---

[১২] সায়্যিদ কুতুব শহীদ, মা'আলিম ফিত্ তারীক, অনুবাদ আব্দুল খালেক, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১০ সং, ২০০৩ইং) পৃ. ৮৬।

[১৩] ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ৮১।

প্রশ্রয় এবং সার্বিক সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন ছিল। এ সহযোগিতার জন্য তাদের সাথে সম্পর্ক জোরদার ও মজবুত করা একান্তই জরুরী ছিল। হিজরতের পর রাসূল (সা.) তাই মদীনায় মুসলিমদের সাথে হিজরতকারী মুসলিমদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। ফলে তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায় এবং মদীনাবাসী মুসলিমরা ইসলামের জন্য হিজরতকারী মুসলিমদের প্রকৃত আনসারে (সাহায্যকারীতে) পরিণত হয়ে যায়। ইসলামের জন্য মক্কার মুসলিমদের মদীনায় হিজরত এবং মদীনার মুসলিমদের তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের এ অবদানই ইসলামকে বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দান করেছে। ইতিহাসে তাই তারা আনসার ও মুহাজির নামে অমরত্ব লাভ করেছেন। প্রথম দিকেই যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলে ইসলামের অন্যতম মূলভিত্তি ভ্রাতৃত্বের ফাউন্ডেশন দুর্বল থেকে যেত, যা হতো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

গ) মদীনার দুই প্রধান গোত্র ছিল আউস এবং খাযরাজ। দীর্ঘকাল থেকে এ দু'গোত্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ দু'গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে। এ দু'গোত্রের পরস্পর দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ ও শত্রুতা নিমূর্ল করা একান্তই আবশ্যক ছিল। নতুবা তা ইসলামের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করত এবং পরিণতিতে মুসলিমদের শক্তি দুর্বল হয়ে যেত। আল্লাহর রাসূল (সা:) ইসলামের সুমহান আদর্শের উপর তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং ঈমানী সম্পর্কের ভিত্তিত্বে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা পূর্বের সকল শত্রুতা ভুলে যায়। এতে মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। মদীনায় পদার্পণ করে প্রথম দিকেই যুদ্ধে জড়িয়ে পরলে এ সকল সমস্যা দূর করা সম্ভব হতো না। ফলে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হতো এবং এ ধরনের জনবল দ্বারা শত্রু পক্ষের বৃহৎ শক্তির মোকাবিলা করা হয়ত সম্ভব হতো না ।

মদীনার দুই প্রধান গোত্র ছিল আউস এবং খাযরাজ। দীর্ঘকাল থেকে এ দু'গোত্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ দু'গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে। এ দু'গোত্রের পরস্পর দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ ও শত্রুতা নিমূর্ল করা একান্তই আবশ্যক ছিল। নতুবা তা ইসলামের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করত এবং পরিণতিতে মুসলিমদের শক্তি দুর্বল হয়ে যেত।

ঘ) মুসলিম ছাড়াও মদীনায় ইহুদী এবং খৃষ্টানদের বসবাস ছিল। মুসলিমদের আশ্রয়স্থল মদীনাকে সুরক্ষার জন্য তাদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। এজন্য

আল্লাহর নবী (সা) তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন মনে করেন। তিনি তাদেরকে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করেন এবং মদীনার প্রতিরক্ষার জন্য ‘আমরা মদীনাবাসী একজাতি’[14] এর ভিত্তিতে মদীনার সনদ প্রণয়ন করেন এবং তাতে সকলকে স্বাক্ষর করান। এ সনদের শর্ত সমূহের অন্যতম ছিল ‘‘আল্লাহর রাসূল পদাধিকার বলে এর সভাপতি হবেন’’ এবং বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে মদীনাকে রক্ষার জন্য সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেরা স্ব-স্ব খরচে আত্মনিয়োগ করবে। এতে মদীনার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ রাসূলের হাতে এসে যায় এবং সে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যবহার করার সুযোগ পান। অপর পক্ষে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রকাশ্য বিরোধিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। শুরুতেই যুদ্ধ করার অনুতি দিলে মদীনা প্রতিরক্ষার জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন সম্ভব হতো না এবং নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রটি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ হতো না।

ঙ) মদীনার প্রতিরক্ষা এবং বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য মদীনার পার্শ্ববর্তী গোত্র সমূহের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন ছিল। অন্তঃত পক্ষে তাদেরকে নিরপেক্ষ রাখা খুবই জরুরী ছিল। যাতে তারা মুসলিমদের বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার চারপাশের ছোট ছোট গোত্র ও কবীলাসমূহের মধ্যে ব্যাপক দা‘ওয়াতী কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের মধ্য হতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন, অনেক গোত্রের সাথে তিনি সন্ধি স্থাপন করেন। যারা এর বাইরে ছিল তাদের উপর তিনি প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে হিজরতের পর প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করে তিনি পার্শবর্তী এলাকাসমূহে মাঝে মধ্যেই ছোট ছোট টহল দল ও বাহিনী প্রেরণ করেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে বাতাসের গতি জানিয়ে দেয়া। এর ফলে যে সকল গোত্র মুসলিমদের সাথে যোগ দেয়নি, তারা পরিণতির কথা চিন্তা করে নীরব থাকতে বাধ্য হয়। এভাবে তিনি পার্শবর্তী গোত্রসমূহ থেকে যে হুমকির সম্ভাবনা ছিল, তা প্রতিরোধের আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার চারপাশের ছোট ছোট গোত্র ও কবীলাসমূহের মধ্যে ব্যাপক দা‘ওয়াতী কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের মধ্য হতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন, অনেক গোত্রের সাথে তিনি সন্ধি স্থাপন করেন। যারা এর বাইরে ছিল তাদের উপর তিনি প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

---

[14] এখানে একজাতি বলতে এক দেশের অধিবাসী বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখিত কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখেই মদীনায় হিজরতের পরও প্রথমদিকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম বলেন, ‘‘যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় স্থিতি লাভ করলেন এবং আল্লাহ তাঁকে নিজের সাহায্য ও মুমিন বান্দাদের দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করলেন এবং শত্রুতা ও বিদ্বেষের পর তাদের অন্ত:করণে মিল-মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিলেন, তখন কালো এবং সাদার মধ্য থেকে যারা আল্লাহর সাহায্যকারী ও ইসলামের সৈনিক ছিলেন, তারা তাঁকে হিফাজত করলেন এবং তাদের নিজেদেরকে তাঁর সামনে নিবেদন করলেন। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীগণের ভালবাসার উপর তাঁর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তিনি তাদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও অগ্রগণ্য ছিলেন। এ সময় ‘আরববাসী ও ইহুদীগণ একই ধনুক হতে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করে। তাদের প্রতি শত্রুতা ও যুদ্ধের খড়্গ শানিত করে এবং চতুর্দিকে তাদের বিরুদ্ধে হৈ চৈ ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। তখন আল্লাহ তাদেরকে ধৈর্যধারণ, ক্ষমা ও উদারতার নির্দেশ দেন, যতক্ষণ না তাদের শক্তি মজবুত ও বাহু সুদৃঢ় হয়।”[১৫]

৪। প্রতিরোধের অনুমতি দান :

এভাবে মদীনায় মুসলিমদের অবস্থা সুসংহত ও শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার পর তাদেরকে জুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। তবে তা তাদের উপর ফরজ করে দেয়া হয়নি। এ প্রসংগে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

حتى قوبت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ فى القتال ولم يفرض عليهم فقال تعا لى أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

‘‘এমনকি যখন মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি ও বাহু সুদৃঢ় হলো, তখন তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, কিন্তু তা তাদের উপর ফরজ করা হয়নি। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, কারণ তারা নির্যাতিত। আর নি:সন্দেহে আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম’।” (২২, সূরা আল্ হাজ্ব : ৩৯)

৫। অত:পর যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিমদের জন্য ফরজ করে দেয়া হয়। ইবনুল কায়্যিম বলেন, “অত:পর যারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিমদের উপর ফরজ করে দেয়া হয়। তবে যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তাদের বিরুদ্ধে নয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‘

“তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, তোমারাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তবে সীমা

---

[১৫] ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৫৮

লংঘন করো না। কারণ আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'' (২, সূরা আল্ বাকারা : ১৯০)[16]

৬। সর্বশেষে সকল মুশরিকের সঙ্গে যুদ্ধকে ফরজ করে দেয়া হয়। ইবনুল কয়্যিম বলেন,

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة ''অতঃপর তাদের উপর সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ফরজ করে দেয়া হয়।”[১৭] এ স্তরে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন,

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

''তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ কর, যেভাবে তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে''। (৯, সূরা আত্তাওবা : ৩৬)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“আহলি কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনেনা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম হিসেবে গণ্য করেনা এবং সত্য-সঠিক দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও, যতক্ষণ না তারা নিজ হস্তে জিযিয়া প্রদান করে (ইসলামী রাষ্ট্রের) অধীনতা স্বীকার করে নেয়।” (৯, সূরা আত্তাওবা : ২৯)

জিহাদ ও যুদ্ধের উল্লেখিত স্তরভাগ বর্ণনার পর ইবনুল কায়্যিম বলেন,

وكان محرما ثم مأ ذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين

“যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, অত:পর তার অনুমতি দেয়া হয়, এরপর যারা যুদ্ধ বাধায় তাদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয় এবং সর্বশেষে সকল মুশরিকের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়।”[১৮]

যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে ইবনুল কায়্যিমের উপরোক্ত স্তরবিন্যাস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ সকল স্তর ও ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম আদৌ কাম্য নয়। ইবনুল কায়্যিমের উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া বা অন্তত: নিজ অবস্থানে টিকে থাকার মত শক্তি সামর্থ ও অবস্থানগত পরিবেশ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম নিষিদ্ধ। মক্কীস্তরে এবং মদীনার প্রথম দিকে এজন্যই যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। ■

---

[১৬] প্রাগুক্ত।
[১৭] প্রাগুক্ত।
[১৮] প্রাগুক্ত।

৩০ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

মুসলিম উম্মাহ্র উত্থান কিভাবে পতনে পরিণত হলো

আতাউর রাহমান নাদভী

১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, আল্লামাহ্ মওদূদী (রাহি.) ইত্তেহাদুল মুসলিমীন ভারতের হায়দ্রাবাদের মুসলিম নেতাদের কাছে ঈমানী ও ইসলামী দরদমাখা একটি চিঠি লিখেছিলেন। যে চিঠিটি তাঁর দ্বীনী ইলমের গভীরতা, ইসলামের প্রচার, প্রসার ও শারী‘আতের বাস্তবতার প্রতি একনিষ্ঠতা, বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রতিফলন বললেও কম বলা হবে। এটিকে ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তার উপলব্ধি ও ঘটনাবলীর সঠিক বিশ্লেষণের একটি সুস্পষ্ট আয়না বলা যেতে পারে। যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ এবং অত্যন্ত কার্যকর ও শিক্ষণীয় বলে প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ মনে করবেন বলে আমার বিশ্বাস। ভারত-বাংলাদেশ তথা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান পরিস্থিতি এবং জাতীয় অবস্থানের পটভূমিতে আমাদের পাঠকদের সেবায় সেই চিঠিটির আলোকে আমার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করছি।

‘আল্লামাহ মওদূদী (রাহি.) তৎকালীন ভারতের হায়দ্রাবাদের মুসলিম শাসক ও নেতৃবৃন্দকে যে সব দরকারী ও উপকারী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন তা তখন ঐসব নেতৃবৃন্দের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোযোগের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। অথচ তাদেরকে ‘আল্লামার এমন উপদেশ দেয়ার কয়েক মাস পর সেই হায়দ্রাবাদের আসাফিয়ার সালতানাত

‘আল্লামাহ মওদূদী (রাহি.) তৎকালীন ভারতের হায়দ্রাবাদের মুসলিম শাসক ও নেতৃবৃন্দকে যে সব দরকারী ও উপকারী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন তা তখন ঐসব নেতৃবৃন্দের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোযোগের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। অথচ তাদেরকে ‘আল্লামার এমন উপদেশ দেয়ার কয়েক মাস পর সেই হায়দ্রাবাদের আসাফিয়ার সালতানাত ধ্বংস করে দেয়া হলো। তাদের সেই সিংহাসন ভূলুণ্ঠিত হলো।

ধ্বংস করে দেয়া হলো। তাদের সেই সিংহাসন ভূলুণ্ঠিত হলো। অতঃপর মুসলিম সরকার ও শাসকদের সম্পর্কে ডক্টর 'আল্লামা ইকবাল যা বলেছিলেন, তা একটি উদাহরণ হয়ে সবার সামনে উপস্থিত হলো। তিনি বলেছিলেন:

পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম তা হারিয়ে ফেলেছি,
তাই আকাশ আমাদেরকে পৃথিবীতে আছড়ে ফেলে দিয়েছে।

'আল্লামা মওদূদী (রাহি.) তাঁর সেই চিঠিতে যা লিখেছিলেন, তার একটি অংশ পড়লে এবং আজকের পরিস্থিতির আলোকে সেই চিঠির বিষয়বস্তুগুলিকে একীভূত করার চেষ্টা করলে তখন দেখতে পাবেন যে, আমাদের দাওয়াহ্ ও তাবলীগ এবং শিক্ষা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনে অবজ্ঞা ও অবহেলা আজ আমাদের সবাইকে আক্রান্ত করে ফেলেছে। আমাদের মুসলিম উম্মাহ্র ছোট-বড় সবাই আজ সেই একই রোগে ভুগছে। দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও দায়িত্ব হতে দূরত্বের পরিণতি আজ আমাদেরকে কী এক বিচিত্র জায়গা, কতটা ভয়ঙ্কর ও জটিল অবস্থানে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে একবার ভেবে দেখেছেন?

'আল্লামা মওদূদীর (রাহি.) সেই চিঠির বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি:

'ভারতের মুসলিমরা যে ভাগ্য বরণ করছে এবং এখন নিজেদের সামনে যে ভাগ্য দেখতে পাচ্ছে, তা আসলে আমাদের শাসক, আমাদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ, আমাদের ধর্মীয় নেতাদের একটি বৃহৎ দল (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) বিগত শতাব্দীতে আমাদের সাধারণ জনগণের সাথে যে ভুল ত্রুটির আচরণ করেছে এটি তারই ফসল। তাদের উপর মুসলিম হিসেবে যে দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছিল, তারা তাদের সেই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে। যদি তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতেন, যদি তারা তাদের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে ইসলামের সঠিক মডেল পেশ করতেন, যদি তারা তাদের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় ন্যায়, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা মেনে চলতেন এবং ইসলামের সত্য প্রচারে তাদের পুরো শক্তি ব্যয় করতেন তাহলে আজ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মুসলিমদেরকে যেভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে এমনভাবে বিতাড়িত করা হতো না।

অথচ এই অঞ্চলগুলো হলো সেই অঞ্চল, যেখানে মুসলিমরা সাত থেকে আটশ বছর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো। যেখানে মুসলিমদের বিশাল ক্ষমতাধর এবং তাদের বিশাল জায়গির প্রতিষ্ঠিত ছিলো। যেখানে শত শত বছর মুসলিম সভ্যতা এবং তাদের বিজ্ঞান ও শিল্পকলা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু সেখানে তারা বিলাসিতার জগতে ডুবে ছিলো। সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হয়ে সময় পার করেছে। ইসলামের দাওয়াতের প্রচার প্রসারে অবহেলা করে ব্যক্তিজীবনে এবং সামষ্টিক আচরণে ইসলামের নীতি-নৈতিকতা থেকে বিচ্যুতির ফলে এসব এলাকার সাধারণ জনগণ অমুসলিমই থেকে গেলো। ইসলামের কোনো সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য তাদের চোখে পড়লো না। আর তাই মুসলিমরা তাদের তুলনায় আটার মধ্যে লবণের

সমান রয়ে গেলো। অমুসলিমদের অন্তরকে ইসলামের জন্য বশীভূত না করে দ্বীন ও শারী‘আতের প্রতি আকৃষ্ট না করে তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপে সেই অমুসলিদের সামনে ঘাড় ও মাথা নত করে থেকে এই দীর্ঘ সময় পার করে দিলো। অতঃপর যখন তাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলো এবং তাদের উপর একটি বিদেশী জাতি চেপে বসলো তখনও তারা এবং তাদের নেতারা সেই কারণগুলি বোঝার চেষ্টা করেননি। যার কারণে তারা বিদেশী শাসকের অধীনে তাদের আনুগত্য মেনে নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। তারা প্রতিবেশী সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক দাবি এই তৃতীয় শক্তি অর্থাৎ বিদেশী শাসকদের কাছে উত্থাপন করতে শুরু করেছিলো। অথচ এই তৃতীয় শক্তির ক্ষমতা যেভাবেই হোক তা সাময়িক হওয়ার কথা ছিলো। এই পুরো সময়কালে মুসলিমরা জীবনের অবকাশের মধ্যে তাদের নৈতিকতার সংস্কার এবং তাদের বড়দের ভুল সংশোধন করার পরিবর্তে, নিছক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লাভের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে মনে হচ্ছিল তারা জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের নিজেদের কবর খুঁড়েছে। অবশেষে আজ আমাদের দুর্ভাগা চোখ দেখলো যে, এই কবরে আমাদের অনেককে সমাহিত করা হয়েছে এবং যারা জীবিত আছে তাদেরকেও সেখানে সমাহিত করা হবে।’[১]

আমি আপনি এবং আমরা সবাই এখন যে দেশে বসবাস করছি, সেখানে মানবিক কাজ, দাওয়াত ও তাবলিগ, সমাজসেবা এবং জাতীয় ও সামাজিক কাজ করার কতটা প্রয়োজন তা ‘আল্লামার এই লেখাটা পড়ার পর আর কারো বুঝতে বাকি থাকে না। মুসলিম উম্মাহ্ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কি এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক এবং দাওয়াতী কাজগুলি সম্পাদন করার কতটা প্রয়োজন রয়েছে এবং বাধ্যতামূলক মনে করতে হবে তা প্রত্যেক দ্বীন দরদী ভাই ও বোনের বুঝতে আর বাকি থাকার কথা নয়। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানসহ মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা, জুম‘আহ্ বারে মাসজিদের মিম্বার হতে নাসীহাহ্, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইজগুলো ব্যবহার করে দাওয়াতী ম্যাসেজ আদান-প্রদান করা, দাওয়াতী প্রচারপত্র বিতরণ, প্রবন্ধ রচনা, দাওয়াতী সফর, একাডেমিক সেমিনার ও সিম্পোযিয়ামসহ সামাজিক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা আমাকে আপনাকে সবাইকে করতেই হবে। কারণ দাওয়াতের কাজের সাথে সাথে হিকমাত ও উত্তম খুতবা বা নাসীহাহ্ এবং উত্তম যুক্তি দাওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে রাখতে হবে।

শেষ একটি বিষয় উল্লেখ করা খুবই জরুরী মনে করছি। আর তা হলো, আমাদের সামনে দাওয়াতের বিষয়গুলো নির্দিষ্ট থাকা উচিত। যেমন আমরা সীরাতে রাসূলের

---

[১] বিস্তারিত পড়ুন: তারজুমানুল কোরআন, জুন ১৯৯৬।

মধ্যে দেখতে পাই যে, রাসূল (সা) নাবুওয়্যাতের প্রথম যুগে শুধুমাত্র আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা অতঃপর নবুওয়্যাত, কোরআনের দাওয়াত, পরকালের ধারণা ও হিসাব নিকাশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস, মানব সমাজে মানবতার স্থান এবং মানবতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। আমাদেরকেও তাই করতে হবে। রাসূল (সা) এর দাওয়াহ্ পদ্ধতির গুরুত্ব অনুধাবন করাও কিন্তু দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাসূল (সা) জাতি, ভাষা, বর্ণ ও ভৌগলিক পার্থক্যকে উপেক্ষা করে মানবতার বিস্তৃত ধারণার উপর তাঁর দাওয়াহর ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। মানুষকে সঠিক আকীদাহ্ বিশ্বাস ও চিন্তাধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিক বৈষম্য এবং উচু-নীচু মনোভাবের মূলোৎপাটন করে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করে এক মহান সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মহানবী (সা) আল্লাহ্র বিশুদ্ধ ‘ইবাদতের ভিত্তিতে তাঁর দাওয়াহ্ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য দাওয়াত নিয়ে বের হয়ে এমন পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন যে, যারা এতে যোগ দিয়েছিলেন তারাই হয়ে ওঠেন মানব জাতির মাঝে সেরা মানুষ ও মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং দাওয়াতের সকল ময়দানে আন্তরিকতা, নিঃস্বার্থতা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতাকে তারা নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়েছিলেন। আর এই একটি কারণে তারা স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বকে জয় করতে পেরেছিলেন। ইসলামকে সার্বজনীন একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে অন্যদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তদানীন্তন মানব সমাজকে ইসলামের সুন্দর সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে পরিচিত করিয়ে সমগ্র বিশ্বের পুরো মানচিত্রকে বদলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর নাবুওয়্যাতে মুহাম্মাদীর সত্যতা ও বাস্তবতা সবার মাঝে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজও হকের দা‘ঈদের এবং দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এই ব্যাপক ধারণা নিয়ে দাওয়ার দায়িত্ব পালন করা এবং বর্তমান সময়ের সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করার জন্য দাওয়াতের ময়দানে নাববী পদ্ধতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এটি করতে পারলে ইনশা আল্লাহ্ সফলতা আমাদের পায়ে এসে চুমু খাবে। ■

* লেখক : ডিরেক্টর সেন্টার ফর জেনারেল এডুকেশন (সিজিইডি), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

‘মব জাস্টিস’ : সম্প্রতি একটি আলোচিত ইস্যু

এডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী

সম্প্রতি বাংলাদেশে মব জাস্টিস নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। মব জাষ্টিসের শিকার হয়ে অনেক নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রাণ ঝরে পড়েছে। এ অবস্থায় মব জাষ্টিস সম্পর্কে জনসাধারণের প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

মব জাষ্টিস: এটি হলো গণতন্ত্রের একটি অবক্ষয়িত রূপ, যেমনভাবে মব (সড়ন) অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতা। জাস্টিস (Justice) অর্থ বিচার বা ন্যায় বিচার। ‘মব জাস্টিস’ অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার।

“মব জাস্টিস” (Mob Justice) বলতে জনতার হাতে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা বোঝানো হয়। সাধারণত, কোনো অপরাধ বা অপরাধীকে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বিচার না করে, উত্তেজিত জনতা নিজেরাই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার চেষ্টা করে। অর্থাৎ এটা একধরনের উচ্ছৃঙ্খল গণবিচার বোঝায়।

এই ধরনের ঘটনা সাধারণত আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা বা অপরাধের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো থেকে ঘটে। মব জাস্টিসের ফলে অনেক সময় নিরীহ মানুষও অবস্থার শিকার হতে পারে। এটি সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা হিসেবে দেখা হয়।

মব জাস্টিস একটি ফৌজদারি অপরাধ: মব জাস্টিস হল একটি ফৌজদারি অপরাধ, ১৯৬০ সালের ফৌজদারি কোডের ২৯ আইন অনুযায়ী- যা জনতার বিচারের বিভিন্ন দিককে কভার করে। ধারা ৪৬ অনুযায়ী “যে খুন করবে সে মৃত্যুদণ্ড করবে”।

মব জাস্টিসকে আইনগতভাবে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এতে ন্যায়বিচারের পরিপন্থী কার্যকলাপ ঘটে। এটি সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে।

মব জাস্টিস সংঘঠিত হবার পক্রিয়া: মব জাস্টিস (Mob Justice) সাধারণত বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে সংঘটিত হয়। এ ধরনের ঘটনাগুলো হঠাৎ উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

১. **ঘটনার সূত্রপাত:** কোনো অপরাধ বা অন্যায় ঘটলে (যেমন চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ বা হত্যার অভিযোগ) স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রায়শই গুজব বা প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

২. **উত্তেজনা বৃদ্ধি:** মানুষের ভেতরে ক্ষোভ, অবিশ্বাস, বা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি হয়, বিশেষ করে যখন তারা মনে করে যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথেষ্ট

দ্রুত বা কার্যকরভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তখন কোনো একজন ব্যক্তি বা কিছু মানুষ উত্তেজিত জনতাকে আরও উত্তেজিত করে তুলতে পারে। এই উত্তেজনা দ্রুত লোকজনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

৩. **অভিযুক্তের ধরপাকড়:** যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা জনতার সামনে আসে বা ধরা পড়ে, তখন উত্তেজিত জনতা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে তাদের হস্তান্তর না করে নিজেরাই শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে। এটি হতে পারে মারধর, নির্যাতন, বা আরও গুরুতর সহিংসতার মাধ্যমে।

৪. **গুজব ও ভুল তথ্যের প্রচার:** মব জাস্টিসের সময় অনেক ক্ষেত্রে সত্য ঘটনা এবং গুজবের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায় না। মিথ্যা অভিযোগ বা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে নিরীহ ব্যক্তিরাও হামলার শিকার হতে পারে।

৫. **সহিংসতা এবং নৃশংসতা:** উত্তেজিত জনতা প্রায়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সহিংস হয়ে ওঠে। মারধর, শারীরিক নির্যাতন, এমনকি হত্যার ঘটনাও ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের সহিংসতা প্রমাণবিহীন বা বিচার ছাড়াই ঘটতে পারে।

৬. **পরিণতি ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপ:** যখন পরিস্থিতি খুবই গুরুতর হয়ে ওঠে, তখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে সহিংসতা ঘটে যায়। প্রায়ই অপরাধীরা পালিয়ে যায়, এবং অনেক সময় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বা দেরি হয়।

৭. **আইনগত প্রতিক্রিয়া:** মব জাস্টিস একটি গুরুতর অপরাধ এবং এর ফলে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তবে, অনেক ক্ষেত্রেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যথাযথ হস্তক্ষেপ না থাকায় এটি বারবার ঘটতে থাকে।

৮. **নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়:** জনসাধারণের মধ্যে আইনি অসচেতনতা, নৈতিক ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ শিক্ষার অভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মত অনৈতিক প্রবনতা তৈরি হয় যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

মব জাস্টিস এর পরিণতি: মব জাস্টিসের (Mob Justice) পরিণতি সাধারণত অনেক গুরুতর এবং ধ্বংসাত্মক হয়, যা ব্যক্তি, সমাজ এবং আইন ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর কিছু উল্লেখযোগ্য পরিণতি হলো:

১. **নিরীহ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে:** মব জাস্টিসে প্রায়ই নিরীহ মানুষও ভুক্তভোগী হতে পারে, যাদের অপরাধের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। অপরাধী প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও অনেক মানুষ জনরোষের শিকার হন এবং তাদের জীবন নষ্ট হয়। অনেক সময় গুজব বা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

২. **আইনের শাসনের ব্যর্থতা:** মব জাস্টিস আইনের শাসনকে অবমাননা করে। যখন মানুষ নিজেই শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব নেয়, তখন এটি প্রমাণ করে যে জনগণের

আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা নেই। ফলে আইনব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

৩. **সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি:** মব জাস্টিস সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতার জন্ম দেয়। আইন এবং নৈতিকতার প্রতি অসম্মান বৃদ্ধি পায়, এবং এতে সামাজিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। সহিংসতার পুনরাবৃত্তি সমাজে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তৈরি করে।

৪. **বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া:** মব জাস্টিসের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া ভেঙ্গে পড়ে, কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার দোষ প্রমাণের সুযোগ না দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। ফলে ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং প্রকৃত অপরাধী চিহ্নিত বা শাস্তি পায় না।

৫. **মানবাধিকার লঙ্ঘন:** মব জাস্টিস প্রায়ই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়। আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে, মানুষকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কোনো নাগরিকের নেই। এটি বিচারবহির্ভূত হত্যার সমতুল্য এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিরুদ্ধে যায়।

৬. **অপরাধের সংস্কৃতি বৃদ্ধি:** মব জাস্টিস অপরাধের চক্র তৈরি করতে পারে, যেখানে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এতে করে অপরাধীরাও নির্দ্বিধায় নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারে, কারণ আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে জনগণ এই সংস্কৃতির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এইসব পরিণতির কারণে মব জাস্টিসকে দমন করতে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

দেশজুড়ে সাম্প্রতিক সহিংসতা উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে: সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের দ্বারা পিটিয়ে মানুষ হত্যা, পার্বত্য দুই জেলায় সংঘর্ষে জনতা নিহত হওয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা দেশজুড়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। এসব ঘটনায় জনসাধারণের আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা, আক্রমণ, ভাঙচুর এবং আগুন লাগানোর ঘটনায় প্রশাসনের দেরিতে হস্তক্ষেপ এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণেও অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এদিকে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটিয়ে দেশে একটা বিশৃংখলা পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রচেষ্টায় রত রয়েছে পরাজিত অপশক্তি।

মব জাস্টিজ নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপসমূহ: বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মব জাস্টিসের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেও, বাস্তবে এর কার্যকর প্রয়োগে বিলম্ব

হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দ্রুত এবং কঠোর পদক্ষেপ ছাড়া মব জাস্টিসের মতো ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে।

এ জন্যে আমাদের যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে-

পরকালমুখী মানসিকতা গঠন, সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর আইন প্রয়োগ, জন সচেতনতা বৃদ্ধি, নৈতিকতা গঠন, জনসাধারণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও মানসিকতা পরিবর্তন ও সংস্কার, সকল ধরনের গুজব প্রতিরোধ স্থানীয় নেতৃত্ব ও কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা জোরদার করা, স্বৈরাচারের শাসনামলে ভঙ্গুর বিচার ব্যবস্থায় মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা, অপরাধের মূল কারণ অনুসন্ধান ও যথার্থ সমাধান, প্রযুক্তি ও মিডিয়ার পজেটিভ ভূমিকা ইত্যাদি।

পদক্ষেপগুলো কার্যকরভাবে গ্রহণ করা হলে, মব জাস্টিসের মতো অপরাধসমূহ ধীরে ধীরে সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।■

আল ফালাহ বিজ্ঞাপন

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া সম্পর্ক

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মালয়েশিয়া এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান মুসলিম রাষ্ট্র। আয়তন ৩২৯৭৫৮ বর্গকিলোমিটার। দেশটি রাজধানী শহর কুয়ালালামপুর এবং পুত্রজয়া হলো ফেডারেল সরকারের রাজধানী। বিষুব রেখার কাছাকাছি অবস্থিত এ রাষ্ট্রটি স্থায়ী সীমান্ত থেকে শুরু করে ফিলিপিন সীমান্ত পর্যন্ত বাঁকা চাঁদের আকারে বিস্তৃত। তবে দক্ষিণ চীন সাগর মালয়েশিয়াকে দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত করে রেখেছে। একটি অঞ্চল মালয়েশিয়ার মূল ভূখণ্ড এবং অন্যটি বোর্নিও দ্বীপের উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল সাবাহ ও সারওয়াক। দক্ষিণ পাশে লাগোয়া রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর এবং পশ্চিমে মালাক্কা প্রণালীর ওপারে রয়েছে সুমাত্রা। ১৩টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে মালয়েশিয়া গঠিত। রাজ্যগুলো হলো- ১. পেরাক, ২. সেলানগার, ৩. নেগ্রীসেমবিলীন, ৪. পাহাং, ৫. যোহর, ৬. কেদাহ, ৭. কেলানতান, ৮. ট্রেংগানু, ৯. পারলিস, ১০. পেনাং, ১১. মালাক্কা, ১২. সারওয়াক, ১৩. সাবাহ।

প্রতিটি রাজ্যই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জনসংখ্যা ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৮২ হাজার ৪১৩ জন। মোট জনসংখ্যার ৬৩.৭% মুসলিম। স্বাধীনতা লাভ ৩১শে আগস্ট ১৯৫৭। স্বাধীনতা দিবস ৩১শে আগস্ট। দেশটি ১৯৫৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাষ্ট্রভাষা বাহাসা মালয়েশিয়া।

এখানকার প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক মালয় ভাষায় কথা বলে। ইংরেজি ভাষার প্রভাব বেশি। এখানে আরো প্রায় ১৩০টি ভাষা প্রচলিত। এর মধ্যে চীনা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা, দায়াক ভাষা, জাভানীয় ভাষা এবং তামিল ভাষা উল্লেখযোগ্য।

মুদ্রার নাম রিংগিত। মালয়েশিয়া একটি সম্পদশালী রাষ্ট্র। আসিয়ান ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া সর্বপেক্ষা ধনী রাষ্ট্র। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। মালয়েশিয়ার অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত মুক্ত। বর্তমানে মালয়েশিয়া একটি উঠতি শিল্প উন্নত বাজার অর্থনীতির দেশ বলে পরিচিত। সরকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রটির অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া সম্পর্কের অতীত ইতিহাসঃ

সাগর উপকূলবর্তী বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের সাথে মালয় ভূ-খণ্ডের সম্পর্ক হাজার বছরের। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈনদের মাধ্যমে এই দুই ভূ-খণ্ডেই প্রায় একই সময়ে ইসলাম প্রচারিত হয় এবং ধীরে ধীরে জনগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু মানুষ অতীতকালে মালয়েশিয়ায় বসতি স্থাপন করে

সেখানে স্থায়ী হয়ে গেছেন বলে জানা যায়। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক কারণে মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক গভীর।

বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান:

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথেই মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান করে। ১৯৭২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ইন্দোনেশিয়াও একই দিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি দানের পরপরই বাংলাদেশ মালয়েশিয়া ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। মালয়েশিয়া থেকে প্রথম রাষ্ট্রদূত হয়ে আসেন আলী বিন আব্দুল্লাহ। তিনি ১৯৭৫ সালের ২০ জুন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। কুয়ালালামপুরে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন জমির উদ্দিন আহমদ (১৯৭৩-১৯৭৫)।

বাংলাদেশ মালয়েশিয়া একই সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সদস্য ভুক্ত হয়ে একই সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সংস্থা সমূহ হচ্ছে- ১. জাতিসংঘ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, ২. কমনওয়েলথ অব নেশনস, ৩. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM), ৪. ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (OIC)। ৫. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB), ৬. উন্নয়নশীল-৮ (D-8), ৭ আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম (ARF)।

সফর বিনিময়

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মালয়েশিয়া সফর করেন। মালয়েশিয়ার রাজা (রাষ্ট্রপ্রধান) সুলতান টিংকু আব্দুল হালিম এবং ফার্স্ট লেডি বারমার সুরী ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। তেজগাঁও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী তাদের আন্তরিক আভ্যর্থনা জানান। সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল তাদেরকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। ৪ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সাথে মালয়েশিয়ার সুলতান টেংকু আব্দুল হালিম এর মধ্যে এক শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ২০২৪ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সফর করেন। এটি ছিলো স্বৈরাচারের পতন ও অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর কোন বিদেশী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের প্রথম সফর। আনোয়ার ইব্রাহিম সফরকালে নতুন সরকারের উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা পুনর্গঠনে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতার কথা বলেন। স্বল্প সময়ের হলেও এ সফর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। সম্পর্ক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের ঘোষণা দেন সফরকারী প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে নানা জটিলতায় মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা ১৮ হাজার

শ্রমিককে সে দেশে যেতে সহায়তা করার ঘোষণা দিয়েছেন। মূলতঃ কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচারী সরকারের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে ২০২৪ সালের জুন মাসে অন্তত ৩১ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় যেতে পারেন নি। এ জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তার মদদপুষ্ট দুষ্টচক্র দায়ী। অথচ ভিটেমাটি বিক্রি করে, পরিবারের গয়নাগাটি বিক্রি বা বন্ধক রেখে, ধারকর্জ করে মালয়েশিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নেন ওই সব কর্মী। কিন্তু পূর্বের স্বৈরাচারী সরকারের ব্যর্থতার মধ্যে প্রবাসী কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতা অন্যতম।

মালয়েশিয়া বাংলাদেশের অন্যতম বড় শ্রমবাজার এবং বাংলাদেশে অষ্টম শীর্ষ বিনিয়োগকারী দেশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ছিলো ৩৮৬ কোটি মার্কিন ডলার। এমতাবস্থায় আনোয়ার ইব্রাহিমকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে বর্তমান সরকারের কাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের একজন প্রকৃত বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিশ্বস্ত বন্ধুও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মালয়েশিয়ার সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। সেই সাথে আসিয়ান কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশকে ‘সেক্টরাল ডায়লগ পার্টনার’ করার বিষয়টিও উত্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও অর্থনৈতিক সহযোগিতা, রাজনৈতিক সম্পর্ক, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্প, প্রযুক্তি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়ে পারস্পরিক আগ্রহের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম প্রথম পর্যায়ে ১৮ হাজার কর্মী নেয়ার পর পর্যায়ক্রমে এ সংখ্যা আরো বাড়ানোরও আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তার দেশে আরো জনশক্তি প্রয়োজন। তবে উভয় দেশের মধ্যে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। নতুন প্রযুক্তি, ডেটা সেন্টার প্রভৃতি ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে সম্মতির কথা উভয়ে জানান। ■

মালয়েশিয়া বাংলাদেশের অন্যতম বড় শ্রমবাজার এবং বাংলাদেশে অষ্টম শীর্ষ বিনিয়োগকারী দেশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ছিলো ৩৮৬ কোটি মার্কিন ডলার। এমতাবস্থায় আনোয়ার ইব্রাহিমকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে বর্তমান সরকারের কাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলাম প্রচারে আন্তঃধর্মীয় সংলাপঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

ইসলাম সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে পরস্পর ভাব ও মত বিনিময়ের নামই হলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। এটি ইসলামী দাওয়াত প্রচারের একটি অন্যতম কৌশল। ইসলামের একমাত্র লক্ষ্যই হলো সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ দায়িত্ব দিয়েই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে এই সংলাপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে চিন্তাশক্তি জাগ্রত ও সুন্দর হয়, উভয়পক্ষর প্রকৃত প্রমাণ উপস্থাপন ও প্রকাশের সুযোগ পায়, ধর্মের ওপর আরোপিত বিভিন্ন অপবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান দেয়া হয়, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়, বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মাবলম্বীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং ইসলামের সত্যতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আলোচ্য প্রবন্ধে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পরিচয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় নবী-রাসূল কর্তৃক আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও মুহাম্মাদ (সা) এর যুগের কাফির-মুশরিক, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে সংঘটিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে এই সংলাপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে চিন্তাশক্তি জাগ্রত ও সুন্দর হয়, উভয়পক্ষর প্রকৃত প্রমাণ উপস্থাপন ও প্রকাশের সুযোগ পায়, ধর্মের ওপর আরোপিত বিভিন্ন অপবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান দেয়া হয়, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়, বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মাবলম্বীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং ইসলামের সত্যতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

১. আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পরিচিতি

আভিধানিক অর্থ : আন্তঃধর্মীয় সংলাপ দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সংলাপ শব্দের আভিধানিক অর্থ কথোপকথন, আলাপ, নাটকের চরিত্রসমূহের পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা।[১]

আর আরবীতে এর প্রতিশব্দ হলো ‘আল-হিওয়ার’ (الحوار)। মূলত ‘আল-হিওয়ার’ (الحوار) শব্দটি ‘আল-হাওর’ (الحور) মূলধাতু থেকে উৎকলিত। যার অর্থ কোনো কিছু হতে অন্য কিছুর দিকে ফিরে আসা[২]; কোনো কিছু বেড়ে যাওয়ার পর তা আবার কমে যাওয়া ইত্যাদি।[৩]

ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হলো Dialogue, Conversation, Friendly discussion; Talk, Argument.[৪]

পারিভাষিক অর্থ : আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পারিভাষিক সংজ্ঞায় মনীষীগণ বিভিন্ন রকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন:

ক. প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সালিহ ইবন ‘আব্দুল্লাহ ইবন হামীদ রহ. বলেন :

هو مناقشة بين طرفين أو أطراف بقصد تصحيح الكلام، وإظهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، ورد الفاسد من القول والرأي.

“কোনো বক্তব্যকে সঠিক মানদণ্ডে উন্নীত করা, কোনো বিষয়ে দলীল-প্রমাণ পেশ করা, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করা এবং কোনো ভ্রান্ত মতকে প্রত্যাখ্যান করার নিমিত্তে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনাকে সংলাপ বলা হয়।”[৫]

খ. খালিদ মুহাম্মদ আল-মুগামিসি বলেন:

هو حديث بين طرفين أو أكثر حول قضية معينة، الهدف منها الوصول إلى الحقيقة بعيدا عن الخصومة والتعصب، بل بطريقة علمية إقناعية، ولا يشترط فيها الحصول على نتائج فورية.

“প্রকৃত সত্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে পারস্পরিক এমন আলাপ-আলোচনা; যা প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় পরিচালিত, ঝগড়া

---

১. সম্পাদকমন্ডলী, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত সংস্করণ,(ঢাকা:বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ১১০২।

২. ইবন মানযূর আল-আফরীকী, *লিসানুল ‘আরব* (বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল ‘আরাবী, ১৪১৩ হি.), খ. ৪, পৃ. ২১৭।

৩. মুহাম্মদ শামছুদ্দীন খাজা, *আল হিওয়ার আদাবুহু ওয়া মুনতালাকাতুহু ওয়া তারবিয়াতুল আবনাই ‘আলাইহি*, (রিয়াদ: মারকাজুল মালিক আব্দুল আযীয লিল হিওয়ার আল ওয়াতানী, ২০০৮ খ্রি.) পৃ.১৭

৪. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut: Librairie Du Liban, 3rd Edit.), p.213

৫. সালিহ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ, *মা‘আলিম ফি মানহাজিদ্ দাওয়াহ্* (জিদ্দা : দারুল আন্দালুস আল-খাদরা, ১ম সংস্ক. ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ.২১২।

বিবাদ ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রীতিমুক্ত এবং তাৎক্ষণিক ফলাফল লাভের আকাংখা বিমুক্ত।”[৬]

গ. ড. মুহাম্মদ আলী জা‘লুক বলেন :

حديث بين طرفين او اطراف عدة لعرض وجهات النظر فيهم حول مسألة تنازع عليها، بقصد التوصل إلى حل مناسب، او نتيجة مناسبة.

“সংলাপ হল বিরোধপূর্ণ কোনো বিষয়ে পরিপূর্ণ অথবা কাছাকাছি সমাধানে পৌঁছার লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কথোপকথন।”[৭]

ঘ. আব্দুর রহমান আন-নাহ্‌লাবী সংলাপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: “দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এমন কথোপকথনকে সংলাপ বলে যাতে লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুর মিল থাকবে আর পর্যালোচনা হবে একটি নির্দিষ্ট ইস্যুতে। এর কোন ইতিবাচক ফল হতে পারে; আবার এমনও হতে পারে যে, কেউ কারো দ্বারা পরিতুষ্ট নয়। তবে শ্রোতা এ সংলাপ থেকে উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করতে পারে।”[৮]

২. কুরআন-হাদীসের আলোকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ইসলামের একটি অচিচ্ছেদ্য অংশ। এটি মূলত ইসলামী দাওয়াত দেয়ার কৌশল অর্থাৎ উত্তম পন্থায় বিতর্ক বা মুজাদালাহ্ বিল হাসান-এর নামান্তর। ইসলামের সুমহান আদর্শ উপস্থাপন এবং অমুসলিমদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

ধর্মের সঠিক বক্তব্য এবং আবেদন মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই মহান আল্লাহ এ সংলাপের নির্দেশ দিয়ে বলেন :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

“তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়।”[৯]

সংলাপের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার সকল মানুষ যেহেতু একজন নর ও একজন নারী থেকে এসেছে সেহেতু মানুষের মধ্যে

---

[৬] খালিদ মুহাম্মদ আল-মুগামিসি, *আল হিওয়ার আদাবুহু ওয়া তাতবিকাতুহু ফীত তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ* (রিয়াদ: মারকাজুল মালিক আব্দুল আযীয লিল হিওয়ার আল ওয়াতানী, ১৪২৫হি.) পৃ ২২।

[৭] মুহাম্মদ শামছুদ্দীন খাজা, *আল হিওয়ার আদাবুহু ওয়া মুনতালাকাতুহু ওয়া তারবিয়াতুল আবনাই ‘আলাইহি* (রিয়াদ : মারকাজুল আব্দুল আযীয লিল হিওয়ারিল ওয়াতান, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৭

[৮] আব্দুর রহমান আন-নাহ্‌লাবী, *উসূলুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ্ ওয়া আছালীবুহা* (দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ.২০৬।

[৯] সূরা আল-হিজর, ১৬ : ১২৫

হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ দূরীভূত করে সমাজে শান্তি ও মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানই কাম্য। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে অন্যধর্মের সন্দেহপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত বিষয়সমূহ স্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং ইসলামের সত্যতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.

“এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আর এটাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।”[১০]

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রিয় রাসূলকেও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁকে খ্রিস্টান, মুশরিক, ইয়াহুদী, সাবেয়ী ও প্রকৃতিবাদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ প্রদান করে তাদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابا مِّن دُونِ ٱللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

“তুমি বল, হে আহলে কিতাবগণ ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক। আর তা হলো- আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ‘ইবাদত করবো না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ কাউকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ করবো না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।”[১১]

৩. ইসলাম প্রচারে পূর্ববর্তী নবীগণের সময়কার আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের স্বার্থে প্রত্যেক যুগেই নবী-রাসূলগণ কাফির, মুশরিকদের ও খ্রিস্টানদের সাথে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রবন্ধের কলেবর বেড়ে যাওয়ার আশংকায় এখানে প্রসিদ্ধ কতিপয় নবী-রাসূলের সমসাময়িক যুগের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের চিত্র তুলে ধরা হলো :

নূহ (আ) এর যুগ

নূহ (আ) ছিলেন আদম (আ) এর পর সর্বপ্রথম শরী‘আত প্রবর্তক তথা পৃথিবীতে আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক প্রেরিত প্রথম রাসূল। তাঁকে আল্লাহ তা‘আলা নবূওয়াত ও রিসালাত দান করেছেন। নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানান এবং সত্য ও হক পথ অনুসরণের শিক্ষা দেন; কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কথা অনুসরণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কেবল মুষ্টিমেয় লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রিসালাত ও নবূওয়াত এবং আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান আনে। নূহ (আ) যে সকল কৌশল ইসলামী দা‘ওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন

---

[১০] সূরা আল-আনয়াম, ৬ : ৫৫

[১১] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৪

তন্মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ছিলো একটি অন্যতম মাধ্যম ও কৌশল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায় ! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদত করো ও তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা তা জানতে!”[১২]

হূদ (আ)-এর যুগ

হূদ (আ) দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী ‘আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ-এর পরে কওমে ‘আদ ছিল দ্বিতীয় জাতি। হূদ (আ) ছিলেন এদেরই বংশধর। ‘আদ ও ছামূদ ছিল নূহ (আ) এর পুত্র সামের বংশধর এবং নূহের পঞ্চম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। ইরামপুত্র ‘আদ এর বংশধরগণ ‘আদ ঊলা’ বা প্রথম ‘আদ এবং অপর পুত্রের সন্তান ছামূদ এর বংশধরগণ ‘আদ ছানী বা দ্বিতীয় ‘আদ বলে খ্যাত।[১৩] হূদ (আ) তার দাওয়াতের প্রাথমিকভাবেই সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অবতীর্ণ হন; বিশেষকরে নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.

“আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না?’ তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ-যারা কুফরী করেছিল,

---

[১২] সূরা নূহ, ৭১ : ২-৪।

[১৩] ‘আদ সম্প্রদায়ের ১৩টি পরিবার বা গোত্র ছিল। আম্মান হতে শুরু করে হাযারামাউত ও ইয়ামান পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল।

তারা বলেছিল, আমরা তো দেখছি তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, বরং আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদের নিকট তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক গঠনে অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হবে। তারা বললো, তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহর 'ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার 'ইবাদত করতো তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা আনয়ন করো। সে বললো, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে; তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি করেছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন সনদ পাঠাননি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।"[১৪]

এমনিভাবে হুদ (আ) তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দাও'য়াত দিয়েছেন আর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার প্রতিউত্তর করেছিলো।

সালেহ (আ) এর যুগ

'আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে ছালেহ (আ) কওমে ছামূদ-এর প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। কওমে 'আদ ও কওমে ছামূদ একই দাদা 'ইরাম'-এর দু'টি বংশধারার নাম। এদের বংশ পরিচয় ইতিপূর্বে হূদ (আ) এর আলোচনায় বিধৃত হয়েছে। কওমে ছামূদ আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজর' যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে একে সাধারণভাবে 'মাদায়েনে সালিহ' বলা হয়ে থাকে। সালিহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বিভিন্ন মাধ্যমে দা'ওয়াত দেন। এর মাধ্যে একটি সফল ও উল্লেখযোগ্য মাধ্যম ছিলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। তিনি প্রথমত তার সম্প্রদায়ের আম জনতার সাথে সংলাপ করেন।

এরপর তিনি নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে সংলাপে অবতীর্ণ হন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ

---

[১৪] সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৬৫-৭১।

مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ.

“তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বললো, তোমরা কি জান যে, সালিহ্ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত?' তারা বললো, তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী। দাম্ভিকেরা বললো, তোমরা যা বিশ্বাস করো, আমরা অস্বীকার করি।”[১৫]

ইবরাহীম (আ) এর যুগ

ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক প্রেরিত বিশিষ্ট নবী ও রাসূল। তিনি হলেন বিশিষ্ট পাঁচজন নবী ও রাসূলগণের অন্যতম এবং মুসলিম জাতির পিতা। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বাল্যকাল থেকেই সত্য উপলব্ধির প্রেরণা দান করেন এবং তিনি তাঁকে বিভিন্ন সময়ে সমস্যায় ফেলে পরীক্ষা করেছেন। ইবরাহীম (আ) সকল পরীক্ষাতেই সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আ) কয়েকটি ধাপে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অবতীর্ণ হন। যেমন : ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পিতার মধ্যকার সংলাপ, ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যকার সংলাপ, ইবরাহীম (আ) ও রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যকার সংলাপ এবং ইবরাহীম (আ) ও তাঁর প্রাণ প্রিয় সন্তানের মধ্যকার সংলাপ। ইবরাহীম (আ) প্রথম আন্তঃধর্মীয় সংলাপ শুরু করেন তাঁর পিতার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.

“তাদের নিকট ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করো। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কিসের ‘ইবাদত করো? তারা বললো, আমরা মূর্তির পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের পূজায় নিরত থাকব। সে বললো, তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শুনে? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে? তারা বললো, না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এইরূপই করতে দেখেছি। সে বললো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, কিসের পূজা করছো। তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা? তারা সকলেই আমার শত্রু জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।

---

[১৫] সূরা আল-আ‘রাফ, ৭ : ৭৫-৭৬।

তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়। এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন; এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অত:পর পুনর্জীবিত করবেন। এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করে দিবেন।”[১৬]

ইবরাহীম (আ) এর আন্তঃধর্মীয় অপর একটি সংলাপ ছিলো তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের মাঝে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْـرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

“তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নেই, যে ইব্রাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বললো, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বললো, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বললো, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করাও তো। অত:পর যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।”[১৭]

লূত (আ) এর যুগ

আল কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে লূত (আ) এর স্ত্রী সম্পর্কিত ঘটনা। লূত (আ) এর স্ত্রীর ঘটনা ছিল কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ। লূত (আ) মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আ) এর ভ্রাতুস্পুত্র। যেহেতু হারানের মৃত্যুকালে লূত (আ) শিশু ছিলেন। সেহেতু ইবরাহীম (আ) ইয়াতীম ভ্রাতুস্পুত্রকে নিজের সন্তানের মত লালন-পালন করেন। লুত (আ) এর সম্প্রদায়ের লোকজন যখন তাঁর দা‘ওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে লাগলো তখন তিনি নতুন নতুন কৌশলে তাদেরকে দা‘ওয়াত দিতে লাগলেন। এ সব কৌশলের মধ্যে একটি অন্যতম কৌশল ছিলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ.

“তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসলো এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা

---

[১৬] সূরা আশ-শু‘আরা, ২৬ : ৬৯-৮২।

[১৭] সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৫৮।

পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই? তারা বললো, তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই; আমরা কি চাই তা তো তুমি জানই। সে বললো, তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতোম কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের!”[১৮]

শু‘আইব (আ) এর যুগ

আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রধান ৬টি প্রাচীন জাতির মধ্যে পঞ্চম জাতি হলো ‘আহলে মাদইয়ান’। ‘মাদইয়ান’ হলো লূত সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। যা অদ্যাবধি পূর্ব জর্ডানের সামুদ্রিক বন্দর ‘মো‘আন’-এর অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কুফরী করা ছাড়াও এ জনপদের লোকেরা ব্যবসা কালে ওযন ও মাপে কম দিত, রাহাজানি ও লুটপাট করত। অন্যায় পথে জনগণের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করত। ঐতিহাসিক বালাযুরী বলেন, ইবরাহীম-পুত্র মাদইয়ানের নামে জনপদটি পরিচিত হয়েছে। শু‘আইব (আ) এদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। ইনি মূসা (আ) এর শ্বশুর ছিলেন। কওমে লূত এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে কওমে মাদইয়ানের প্রতি তিনি প্রেরিত হন। চমৎকার বাগ্মিতার কারণে আমাদের রাসূল (সা) তাঁকে ‘খাত্বীবুল আম্বিয়া’ (নবীগণের মধ্যে সেরা বাগ্মী) বলেছেন। তাঁর অপর নাম ছিল ইয়াছরুন। তাঁকে সুরিয়ানী ভাষায় ‘বিনযুন’ বা বিছরূন বলা হয়। শু‘আইব (আ) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ মতান্তরে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।[১৯]

ইসলামী দা‘ওয়াত প্রচারে শু‘আইব (আ) বিভিন্ন কৌশল ও মাধ্যমের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সকল পদ্ধতি ও মাধ্যমের মধ্যে সংলাপ ছিলো একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল বা মাধ্যম। তিনি তাঁর সম্প্রদায় ও তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অবতীর্ণ হন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘেষণা করেছেন :

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ

---

১৮. সূরা হুদ, ১১ : ৭৮-৮০।

১৯. আস-সাবূনী, মুহাম্মদ ‘আলী, *আন-নবূওয়াহ ওয়াল আম্বিয়া* (বৈরূত : আল-মাঝরা‘আ বিনায়াতুল ঈমান, ১৪০৫হি.),পৃ.২৮২।

الْحَاكِمِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

“আমি মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শু‘আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই; তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মু'মিন হলে তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর। তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা কোন পথে বসিয়া থাকবে না, আল্লাহর পথে তাদেরকে বাধা দিবে না এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে না। স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য করো। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন; আর তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা বললো, হে শু‘আইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করবই অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে। সে বললো, যদি আমরা তা অপছন্দ করি তবুও? তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই, তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও আর তুমিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।”[২০] (চলবে)

---

[২০] সূরা আল-আ‘রাফ, ৭ : ৮৫-৮৯।

আন্তর্জাতিক

লাগামহীন ইসরাইল

মীযানুল করীম

ইসরাইল তার হামলা আরো সম্প্রসারিত করেছে। লেবাননের পরে ইরানের উপরেও তার থাবা প্রসারিত করেছে। আর ইয়েমেন ও সিরিয়ার উপর হামলা তো আছেই। ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা এবং সিরিয়ার সরকার তাদের শত্রু। সিরিয়ার সাথে ইরানের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলের আক্রমণ তো আছেই। সেখানে রেহাই পাচ্ছে না আশ্রয় কেন্দ্র, হাসপাতাল, স্কুল, জাতিসংঘের কার্যালয় ও উদ্বাস্তুদের সেবা কাজ। ইসরাইল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে উদ্বাস্তুদের সেবা কার্যক্রম সংস্থার সাথে। এতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। লেবাননে ইসরাইলি হামলায় মৃতের সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়িয়েছে। আর গাজায় ওদের হামলায় মৃতের সংখ্যা ৪৩ হাজারের উপরে। একটি সামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও পারমাণবিক স্থাপনা অক্ষত রয়েছে।

ইসরাইল ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চলেছে। ফাঁস হয়ে গেছে তেল আবিবের এমন গোপন তথ্য। তিনটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। একটি সূত্র বলেছে নথিগুলো সঠিক। গোপন নথি ফাঁসের এ ঘটনাকে ‘খুবই উদ্বেগজনক’ বলে সিএনএন এর কাছে মন্তব্য করেছেন একজন মার্কিন কর্মকর্তা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- দু’টি গোপন মার্কিন গোয়েন্দা নথি ফাঁস হয়ে গেছে যাতে বলা হয়েছে, ইরানের সম্ভাব্য হামলার জন্য সামরিক প্রস্তুতি চালাচ্ছে ইসরাইল।

এই নথিগুলো ১৫ এবং ১৬ অক্টোবর ইরানের সঙ্গে যুক্ত একটি টেলিগ্রাম একাউন্ট ‘মিডল ইস্ট স্পেক্টেটর’ এ প্রকাশিত হয়েছিল। এসব নথীতে ইরানের উপর সম্ভাব্য হামলার জন্য ইসরাইলের প্রস্তুতির তথ্য রয়েছে বলে দাবি।

নথী গুলো অত্যন্ত গোপনীয়। এগুলো শুধু যুক্তরাষ্ট্র এবং ‘ফাইভ আই’ (মার্কিন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড এবং ব্রিটেন) মিত্রশক্তি ছাড়া আর কারো কাছে থাকে না। নথীতে হামলার প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে- আকাশ থেকে আকাশে জ্বালানি সরবরাহ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান এবং সম্ভাব্য ইরানি হামালায় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা তৈরি রাখা।

এই গোপন নথীতে বলা হয়েছে- ইরানের বিরুদ্ধে হামলার জন্য ইসরাইল কি প্রস্তুতি নিচ্ছে। ন্যাশনাল জিওস্প্যাশিয়াম ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির একটি নথি অনুযায়ী ইসরাইল গোলাবারুদ মজুদ করা শুরু করে দিয়েছে। আরেকটি নথি বলেছে, ইসরাইলি

বিমান বাহিনী মহড়া দিচ্ছে আকাশ থেকে ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের। ইরানে হামলার প্রস্তুতি নিতেই এই মহড়া বলে ধারণা গোয়েন্দাদের।

নথীগুলো কি হ্যাক হয়েছে? নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁস করা হয়েছে এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো স্পষ্ট নয়। ইরানের হ্যাকিং তৎপরতার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বলেছে এর আগে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচার সংক্রান্ত নথিপত্র গত আগস্টে হ্যাক করেছে ইরান। এফবিআই অবশ্য এ নিয়ে কোন মন্তব্য করেনি।

যখন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইল সম্পর্কে টানা পড়েন চলছে তখনই নথী ফাঁসের এ ঘটনা ঘটলো। ঘটনাটি এখন ইসরাইলিদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করবে। নথী ফাঁস প্রসঙ্গে এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগনের কথিত এসব নথী কে বা কারা ফাঁস করল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এ ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো এফবিআই এর পাশাপাশি পেন্টাগন ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তদন্তের কাজ করে।

ইসরাইল যেকোনো মুহূর্তে হামলা চালাবে ইরানে এ ধারণা পোষণ করছে প্রায় গোটা বিশ্ব। তবে বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ইরান। বরং ইসরাইলকে আরো ভয় দেখাতে এবার বড়সড় নৌ মহড়া শুরু করেছে ইরান। এ মহড়ায় পুরো সঙ্গ দিচ্ছে রাশিয়া। ইরানকে সাহায্য করতে রাশিয়া একাধিক যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে। রাশিয়ার পাশাপাশি মহড়ায় অংশ নিয়েছে ওমান। আর এ মহড়া পর্যবেক্ষণকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, কাতার, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ইসরাইল যেকোনো মুহূর্তে হামলা চালাবে ইরানে এ ধারণা পোষণ করছে প্রায় গোটা বিশ্ব। তবে বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ইরান। বরং ইসরাইলকে আরো ভয় দেখাতে এবার বড়সড় নৌ মহড়া শুরু করেছে ইরান। এ মহড়ায় পুরো সঙ্গ দিচ্ছে রাশিয়া। ইরানকে সাহায্য করতে রাশিয়া একাধিক যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে। রাশিয়ার পাশাপাশি মহড়ায় অংশ নিয়েছে ওমান।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, এ মহড়ার মাধ্যমে ইরান বুঝাতে চাচ্ছে ইসরাইল যদি ইরানে হামলা চালায় তাহলে সমুদ্র থেকে এই উত্তর দেওয়া হবে।

এ মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে ‘আইএমই এক্স ২০২৪’। এ মহড়ার উদ্দেশ্য হল আঞ্চলিক যৌথ নিরাপত্তার উন্নত করা, বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানো, সামুদ্রিক নিরাপত্তা রক্ষায় সদিচ্ছা ও সক্ষমতা প্রদর্শন করা। মহড়ায় অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৌশল অনুশীলনের পাশাপাশি সামুদ্রিক রুট রক্ষা করবে। মানবিক কার্যক্রম বাড়াবে এবং উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের তথ্য বিনিময় করবে।

ইসরাইলের ভয়াবহ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিশোধ নিতে ইরানে বড় ধরনের পাল্টা হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে তেলআবিব। এক্ষেত্রে বাইডেন প্রকাশ্যে ইসরাইলকে ইরানে হামলা করতে বারণ করলেও গোপনে গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে রেখেছেন। মার্কিন সেনা সদর দপ্তর পেন্টাগন থেকে এ তথ্য ফাঁস হয়েছে। এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে।

এরপর থেকে গত ১৫-১৬ অক্টোবর থেকেই ইসরাইলের বিমান ও নৌ বাহিনী ইরানে হামলার প্রস্তুতি নিতে থাকে। হোয়াইট হাউজের নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, গোপন নথী ফাঁসের ঘটনায় বেশ উদ্বিগ্ন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ইরানকে গত ১ অক্টোবরের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাব দিতে বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরাইল। এছাড়া ইরানের যে কোন সম্ভাব্য হামলা ঠেকানোর জন্য ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে।

১ অক্টোবর রাত জুড়ে ইসরাইলে প্রায় ২০০ ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইরানের সেনাবাহিনীর এলিট শাখা ইসলামিক রেভুলেশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। হামলার দুইদিন পর ৩ অক্টোবর ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান কাতারে সাংবাদিকদের সাথে এক মত বিনিময় সভায় বলেন, ইসরাইল যদি গাজা ও লেবাননে সামরিক অভিযান বন্ধ না করে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলা আরো ঘটবে। ইরানের হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য মিত্রদের সাথে নিজেদের সুরক্ষা ও মধ্যপ্রাচ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে নিবিড় আলোচনা শুরু করে ইসরাইল। এই আলোচনার ভিত্তিতেই গত শনিবার ইসরাইলে নিজেদের ক্ষেপণাস্ত্র সুরক্ষা বিষয়ক সমস্ত থাড মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রাগারের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অভিজাত সমরাস্ত্রগুলোর মধ্যে থাড অন্যতম।

ইসরাইলের কৌশলগত স্থাপনা গুলোর গোয়েন্দা তথ্য ইরানকে সরবরাহ করার অভিযোগে সাত ইহুদি বসতি স্থাপনকারীকে আটক করেছে ইসরাইলের নিরাপত্তা বাহিনী। এসব ইহুদি অভিবাসী আজারবাইজান থেকে ইসরাইল এসে বসবাস শুরু

করে এবং গত দুই বছর ধরে তাদের সাথে ইরানের যোগাযোগ ছিল। ইসরাইলের দাবি, আটক ব্যক্তিরা ইসরাইলের হাইফা শহরের পাশাপাশি উত্তর ইসরাইলের বিভিন্ন বসতির অধিবাসী এবং তাদের মধ্যে সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যাওয়া এক ব্যক্তি ও দুই শিশু রয়েছে।

আটক পাঁচ জনের নাম প্রকাশ করেছে ইসরাইলের গণমাধ্যমগুলো। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ- তারা ইসরাইলের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি ও স্থাপনার তথ্য ও অবস্থান ইরানকে জানিয়ে দিয়েছে এবং ইরান সেই তথ্যের ভিত্তিতে এপ্রিল ও অক্টোবরের দুই দফা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। যেসব স্থাপনার তথ্য ইরানকে দেবার দাবি করা হয়েছে সেসবের মধ্যে রয়েছে, কিরিয়া সামরিক সদর দপ্তর, নেভাতিম ও রামাত ডেভিড বিমান ঘাঁটি, হাদেরা পাওয়ার প্লান্ট এবং বিভিন্ন স্থানে বসানো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোম।

নেভাতিম বিমান ঘাঁটি চলতি বছর ইরানের দুই দফা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া রামাত ডেভিড বিমান ঘাঁটিতে গত ২২ সেপ্টেম্বর লেবাননের হিজবুল্লার রকেট আঘাত হানে। এমন সময় ইরানকে তথ্য দেয়ার দায়ে ইসরাইলি ৭ নাগরিককে আটক করা হলো যখন তেল আবিব এতদিন দাবি করে আসছিল ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু যেসব স্থাপনার তথ্য পাচারের অভিযোগে আটক অভিযান চালানোর কথা বলা হচ্ছে এসব স্থাপনা ও আয়রন ডোম ব্যবস্থা ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইসরাইল বিমান হামলা চালিয়েছে গাজার উত্তরাঞ্চলের বেইত লাহিয়া শহরে। এই হামলায় নারী ও শিশু সহ ৮৭ জন নিহত ও আহত হয়েছে আরো অনেকে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, স্থানীয় সময় ১৯ অক্টোবর গভীর রাতে চালানো এই হামলায় বাড়ি ঘরের ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় পড়ে আছে আরো মানুষ। তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না এম্বুলেন্স।

হামাস পরিচালিত কর্তৃপক্ষ গত ২০ অক্টোবর রাতে বলেছিল, বোমা হামলায় ৭৩ জন নিহত হয়েছে। ইসরাইল বলেছে তারা হতাহতের সংখ্যা খতিয়ে দেখছে। হামাস নিহতের সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে বলেই তাদের বিশ্বাস। কারণ ইসরাইলের সেনাবাহিনীর পাওয়া তথ্যের সঙ্গে হামাস কর্তৃপক্ষের দেওয়া হিসাব মিলছে না।

হামাসের নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার নিহত হওয়ার পর ইসরাইল গাজায় আরও জোর হামলা চালাচ্ছে। হামাসের হাতে জিম্মি বন্দীরা ঘরে না ফেরা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এদিকে কর্মকর্তা, কুটনীতিক ও অন্যান্য সূত্র বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন এগিয়ে আসছে এই সময় ইসরাইল তাদের সীমান্ত সুরক্ষায় এবং হামাস যাতে পুনরায় সংঘটিত হতে না পারে তা নিশ্চিত করতে সামরিক অভিযান জোরদার করেছে। ইসরাইলের বিমান

দক্ষিণ গাজায় সিনওয়ারের ছবি এবং বার্তা লেখা লিফলেট ছড়ায়। তাতে লেখা ছিল- হামাস আর গাজা শাসন করবে না।

এরপরেই ১৯ অক্টোবর দিন শেষে উত্তর গাজার বেইত লাহিয়ায় বহুতল একটি ভবনে ইসরাইল বিমান হামলা চালালে হতাহতের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসা কর্মীরা এবং হামাস।

গাজার উত্তর অঞ্চলে ইসরাইল বাহিনীর তীব্র হামলার কারণে মানবিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। হামলায় গাজার শরণার্থী শিবির এবং আশ্রয় কেন্দ্রগুলোকেও রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। হামাসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, টানা ১৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে গাজার উত্তরাঞ্চলে কোন ত্রাণ পৌঁছায়নি। হামাসের জ্যৈষ্ঠ কর্মকর্তা সামি আনু জুহরি এক টেলিভিশন বিবৃতিতে এই অভিযোগ করেন। তিনি আরো বলেন, ইসরাইল মানবিক সহায়তার প্রবাহ রোধ করে রেখেছে এবং উত্তর গাজায় মানবিক সাহায্যের বিষয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছে।

সামি জুহরি আরও অভিযোগ করেন, মধ্য গাজায় সীমিত পরিসরে ত্রাণ বিতরণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু উত্তর গাজার জন্য ১৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে কোন ত্রাণ প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। এছাড়া ইসরাইল তাদের অপরাধ ও গণহত্যার আলামত লুকানোর জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে হামাস। বিষয়টি সেখানকার মানুষের জন্য আরও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মধ্য গাজায় সীমিত পরিসরে ত্রাণ বিতরণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু উত্তর গাজার জন্য ১৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে কোন ত্রাণ প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। এছাড়া ইসরাইল তাদের অপরাধ ও গণহত্যার আলামত লুকানোর জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে হামাস। বিষয়টি সেখানকার মানুষের জন্য আরও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলে রকেট হামলার চালিয়েছেন লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এই হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছে। ৭০টি রকেট দিয়ে এই হামলা হয়েছে বলে জানায় তারা।

তেল আবিব শহরের উপকণ্ঠে সামরিক গোয়েন্দা ইউনিটের ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দাবি করেছে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ। এ হামলার পর তেল আবিবে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। সাময়িক বন্ধ করে দেয়া হয় বেনগুরিয়ন বিমানবন্দরের কার্যক্রম।

হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, তেল আবিবের দক্ষিণাঞ্চলের উপকণ্ঠে গ্লিলত সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট ৮২০০ এর ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। এর আগে তেল আবিবের উপকণ্ঠে নিরিত এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি করেছে তারা। তেল আবিব ও হাইফায় প্রথম বারের মতো মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের কথাও জানিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠিটি। দাবি করা হয়েছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হাইফা শহরের 'স্টেলা ম্যারিস নৌ ঘাঁটিতে' এ হামলা চালানো হয়েছে।

এদিকে হামলার পর পরই তেল আবিবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সাইরেন বাজতে শোনা যায়। এ সময় শহরটির বেনগুরিয়ন বিমানবন্দরে উড়োজাহাজ ওঠানামা সাময়িক বন্ধ করে দেয়া হয়। ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে হামলায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

এছাড়া তেলআবিবের কাছে সিজারিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার একটি ছবি টেলিগ্রামে পোস্ট করেছে হিজবুল্লাহ। যদিও এর বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। সিজারিয়ায় ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বাস ভবন রয়েছে।

এর আগে সিজারিয়ায় নেতানিহুর বাসভবনে আঘাত হানে হিজবুল্লাহর একটি ড্রোন। এই সময় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী সেখানে ছিলেন না। এ ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে জানায় ইসলায়ের সামরিক বাহিনী।

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থল অভিযানের পাশাপাশি লেবাননে ব্যাপক বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরাইল। ২৪ ঘণ্টায় হিজবুল্লাহর ৩০০টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরাইলী বাহিনী।

রাজধানী বৈরুতের উপকণ্ঠে দেশটির সবচেয়ে বড় হাসপাতাল চত্বরে ইসরাইলের বিমান হামলায় ৪ জন নিহত ও ২৪ জন আহত হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

পূর্বাঞ্চলীয় শহর বালবেকে ইসরাইলের হামলায় ৬ জন নিহত হন। এ হামলায় হিজবুল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৪ উদ্ধারকর্মীও নিহত হয়েছেন।

ফিলিস্তিনের উত্তর গাজায় জাবালিয়া, বৈইত হানুন ও বেইত লাহিয়া শহর অবরুদ্ধ করে দুই সপ্তাহের বেশি সময় স্থল অভিযান চালাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী। সেখানে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করতেও দেয়া হচ্ছে না। ফলে রাস্তা-ঘাট ও বিধ্বস্ত ভবনের নিচে পড়ে থাকা লাশ পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে।

জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সংস্থা ইউএন আরডব্লিউ-এর প্রধান ফিলিপ্পে লাজ্জারিনি বলেছেন, রাস্তাঘাট ও ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে লাশ পড়ে থাকায় সর্বত্র দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। লাশ উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা প্রদানের সুযোগও দেয়া হচ্ছে না।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইলের হামলায় ৪৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ও অবরুদ্ধ ভূখণ্ড গাজায় যুদ্ধরিতি কার্যকর না হলে সশস্ত্র বাহিনীর চাকরি ছাড়ার হুমকি দিয়েছেন ইসরাইলি সেনারা। এরই মধ্যে দেড় শতাধিক সেনা এই বিষয়ে ইসরাইলি সশস্ত্র বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে চিঠি দিয়েছেন। এর কিছুদিন আগে ইসরাইলি সশস্ত্র বাহিনীর ১৩৮ জন সেনা চিঠি লিখে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানান, গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হলে তারা আর বাহিনীতে থাকবেন না। এই চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের একজন নারী। সর্বশেষ আরো ১৫ জন সেনা একই ইস্যুতে চিঠি লিখে ইসরাইলি সমর কর্তাদের হুমকি দিয়েছেন।

চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের কয়েকজন জানিয়েছেন তারা এরই মধ্যে বাহিনীর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তারা আর ইসরাইলি বাহিনীর হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন না। আবার অনেকে বলেছেন, তারা ধৈর্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছেন। গাজায় যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন না হলে তারা আর বাহিনীতে থাকবেন না। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ত, সেনাপ্রধান হেরজি হালেভি এবং সরকারের অন্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা সক্রিয় ও রিজার্ভ সৈনিক এবং অফিসাররা ঘোষণা করছি যে, আমরা এভাবে চলতে পারব না।’

গাজার যুদ্ধে আমাদের ভাইবোন ও জিম্মিদের মৃত্যু হচ্ছে। চিঠিতে আরো বলা হয়, ‘অক্টোবর ৭ তারিখের সেই অভিশপ্ত দিনে আমরা এক ভয়াবহ ও নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের মুখোমুখি হই, যেখানে এক হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয় এবং শত শত মানুষকে আটক করা হয়। আমরা সাথে সাথে সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত হয়ে যুদ্ধে যোগ দিই- আমাদের দেশকে রক্ষার জন্য এবং গাজায় আটকদের উদ্ধারের জন্য। তবে, আজ এটি স্পষ্ট যে, গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কেবল আটকদের মুক্তিকেই বিলিম্বিত করছে না, বরং তাদের জীবনকেও বিপন্ন করছে। অনেক বন্দী ইসরাইলি বাহিনীর বোমা হামলায় নিহত হয়েছে। যা সামরিক অভিযানে উদ্ধার হওয়া মানুষের চেয়ে অনেক বেশি।’

চিঠিতে তারা কবে চাকরি ছাড়বেন, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করেনি। তবে তারা সতর্ক করে দিয়েছেন, সেদিন আসন্ন। চিঠিতে বলা হয়, ‘আমরা যারা কাজে নিবেদিত, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, যদি সরকার অবিলম্বে যুদ্ধের দিক পরিবর্তন না

করে এবং আটকদের বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য একটি চুক্তি এগিয়ে নিতে কাজ না করে, তাহলে আমরা আর কাজ করব না।' তারা আরো বলেন, 'আমাদের মধ্যে অনেকেই এরই মধ্যে অবসরে চলে গেছেন, বাকিরাও যাবেন। সেই দিনটি আসন্ন, যখন আমরা ভরা হৃদয়ে দায়িত্ব পালনে আর হাজির হব না। আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, এখনই একটি চুক্তিতে সই করুন- যাতে আটকদের জীবন রক্ষা করা যায়।'

এদিকে আনাদোলু এজেন্সি জানায়, গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুদ্ধবিরতি নিয়ে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে এসেছে কাতার। বার্লিনে এক বৈঠকে গাজা যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টা নিয়ে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলে সানির সাথে বৈঠক করেছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ। এক বিবৃতিতে জার্মান চ্যান্সেলর মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, চ্যান্সেলর কাতারের আমিরকে হামাসের হাতে আটক ইসরাইলিদের মুক্তি এবং মধ্যস্থতার প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এতে আরো বলা হয়, চ্যান্সেলর আশা প্রকাশ করেছেন যে, হামাস নেতা সিনওয়ারের মৃত্যু এই ধরনের চুক্তির সুযোগ খুলে দেবে। চ্যান্সেলর ও কাতারের আমিরের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন। উভয়েই একমত যে, স্থায়ী শান্তির জন্য বর্ধিত কুটনৈতিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিবৃতি অনুসারে, ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের আলাদা দুই-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে সমাধান হিসেবে আলোকপাত করা হয়। এ নিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও দুই নেতা একমত হয়েছেন।

বার্লিনে এক বৈঠকে গাজা যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টা নিয়ে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলে সানির সাথে বৈঠক করেছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ। এক বিবৃতিতে জার্মান চ্যান্সেলর মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, চ্যান্সেলর কাতারের আমিরকে হামাসের হাতে আটক ইসরাইলিদের মুক্তি এবং মধ্যস্থতার প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের একাধিক আলোচনা করেছেন জার্মান চ্যান্সেলর। যার মধ্যে বার্লিনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট

ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়েব স্টার মারের সাথে কোয়াভ জোটে বৈঠক করেন। এ ছাড়া তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগানের সাথে বৈঠকের জন্য শলৎজ ইস্তাম্বুলে যান। যেখানে দুই নেতা উত্তেজনা কমাতে এবং গাজায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য কুটনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, গাজায় যুদ্ধের সমাপ্তি টানা এখনই ভালো হয়। ইসরাইল সফর শেষে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ইসরাইলের জন্য এখন সামরিক বিজয়কে টেকসই কৌশলগত সাফল্যের রূপ দেয়ার সময় এসেছে। তিনি বলেন, জিম্মিদের মুক্ত করে দেশে ফেরানো, যুদ্ধের সমাপ্তি টানা এবং এরপর কী হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সহ ইসরাইল সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টায় মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছেন ব্লিঙ্কেন। গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টায় পুনরুজ্জীবিত করতে প্রায় এক বছরের মধ্যে এ নিয়ে ১১তম বারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে সফর করেছেন অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। ইসরাইল সফর শেষে ২৩ অক্টোবর সৌদি আরব পৌঁছেন তিনি। তবে ব্লিঙ্কেনের এই সফরের মধ্যেও লেবাননের বন্দর নগরী টাইরে ও গাজার উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। জবাবে তেল আবিবসহ ইসরাইলের কয়েকটি শহর লক্ষ্য করে রকেট ছোঁড়ার দাবি করেছে লেবাননের সশস্ত্র বাহিনী হিজবুল্লাহ।

ইউক্রেনের বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় থাকা বন্দর নগরী টাইরে থেকে গত ২৩ অক্টোবর বিরামহীন হামলা শুরু করে ইসরাইল। এর আগে বাসিন্দাদের ওই শহর ছাড়ার নির্দেশ দেয় ইসরাইলী বাহিনী। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সেখান থেকে লাখো মানুষ অন্যত্র পালিয়ে যান।

মৎস্যশিকারি, পর্যটকদের পাশাপাশি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের অবকাশের স্থান হিসেবে দক্ষিণের এই শহর স সময় সরগরম থাকে। লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তে এই শান্তি রক্ষীদের খালি করে দিতে নির্দেশ দেয় ইসরাইল। এই নির্দেশের আওতায় সেখানকার প্রাচীন দুর্গও রয়েছে।

লেবাননের কিছু নাগরিকের আশঙ্কা, তাঁদের দেশের অবস্থা শেষ পর্যন্ত গাজার মতো হবে। ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় গাজায় ৪৩ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ছোট এই উপত্যকার বেশির ভাগই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ■

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ মেয়েদের অনেকেই নেইল পলিশ ও ঠোঁট পলিশ ব্যবহার করে থাকে। আমার জানার বিষয় হল নেইল পলিশ ও ঠোঁট পলিশ ব্যবহার করা অবস্থায় ওযু ও গোসল হয় কিনা?

সাবিহা, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।

উত্তর : আমাদের দেশের মেয়েদের অনেকে বা কেউ কেউ নখে ও ঠোঁটে নেল পলিশ ও ঠোঁট পলিশ নামে রং জাতীয় এক প্রকার প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকে। আমাদের জানামতে এটা তরল হলেও কিছুটা গাঢ়। যার ফলে এটা নখে লাগালে নখে জমে ও শুকিয়ে যাওয়ার পর নখের উপর একটা আবরণ বা প্রলেপ পড়ে। যার ফলে অযু বা গোসল করলে নখে পানি পৌঁছাতে পারে না। অথচ অযুর ক্ষেত্রে অযুর অঙ্গগুলো যেমন: পুরো মুখমণ্ডল, কনুইসহ দুই হাত, দুই পায়ের টাখনুসহ ধোঁয়া ফরয। অনুরূপভাবে গোসলেও পুরো শরীর ধোয়া ও পুরো শরীরে পানি পৌঁছানো ফরয। এর কোথাও এক বিন্দু পরিমাণ জায়গাও যদি শুকনা থাকে বা এক বিন্দু পরিমাণ জায়গায়ও যদি পানি না পৌঁছে তাহলে তাতে অযু ও গোসল হবে না। ফলে ওযু করেও বিনা ওযু বা অযুবিহীন থেকে গেল। এমতাবস্থায় তার সালাত আদায়, কা'বা ঘর তাওয়াফ কিংবা কুরআন মাজীদ স্পর্শ করে তেলাওয়াত যা-ই করুক না কেন কোনটাই শুদ্ধ হবে না। বরং এমতাবস্থায় এ কাজগুলো করা নিষিদ্ধ ও হারাম হবে। অনুরূপ ঠোঁট পালিশও। অর্থাৎ ঠোঁট পলিশের কারণে ঠোঁটে পানি পৌঁছাতে যদি বাধাগ্রস্থ হয় সেটা পুরা ঠোঁটে হোক কিংবা ঠোঁটের এক বিন্দু পরিমাণ জায়গায় হোক তাতে যেমন অযু হবে না, তেমনি গোসলেও যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে গোসলও শুদ্ধ হবে না। ফলে কোন ব্যক্তি বা কোন নারীর নখে ও ঠোঁটে নখ পালিশ ও ঠোঁট পালিশ লাগানো অবস্থায় যদি সে ওযু বা গোসল করে তাহলে তার ওযু বা গোসল কোনটাই সহীহ হবে না। বরং তিনি গোসল করেও নাপাক, ওযু করেও ওযু বিহীন থেকে যাবেন। অতএব ওযু ও ফরয গোসলের আগে অবশ্যই নখ পালিশ ও ঠোঁট পালিশ সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে ফেলতে হবে। অন্যথায় ওযু ও গোসল কোনটাই হবে না।

প্রশ্ন-২ ঃ বাজারে সবজি বিক্রেতাগণ কিছুক্ষণ পরপর সবজিতে পানি ছিটিয়ে থাকেন। সবজিতে পানি না ছিটালে সবজি সতেজ থাকে না। বরং শুষ্ক ও মলীন হয়ে যায়। আর পানি ছিটালে সবজি সতেজ ও তরতাজা থাকে। একই সাথে কিছুটা হলেও ওজন বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রসঙ্গক্রমে সবজির সাথে পানি বিক্রির বিষয়টি এসে পড়ে। এক্ষেত্রে সবজি বিক্রেতাগণের করণীয় কী?

এলিস খান, কক্সবাজার।

উত্তর : হাটে-বাজারে সবজি তরতাজা ও সতেজ রাখার জন্য দোকানদার ও সবজি বিক্রেতাগণ সবজিতে পানি ছিটিয়ে থাকেন। বাস্তবতা হলো সবজিতে পানি না ছিটালে সবজি তাজা থাকে না বরং শুষ্ক ও মলীন হয়ে যায় এবং তার স্বাদও কমে যায়। ফলে তার

প্রতি ক্রেতাদের চাহিদা ও আকর্ষণ থাকে না। এসব কারণে হাটে-বাজারে সবজি বিক্রেতাগণ সবজিতে পানি ছিটিয়ে থাকেন। এটা প্রয়োজন, দোষের বা অন্যায় কিছু নয়। এতে সবজির ওজন বৃদ্ধি পায় না। ছিটানো পানি নিচে পড়ে যায়। অতি সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেটা উল্লেখ করার মতো নয়। অতএব সবজির সাথে পানি বিক্রির কথাটা সঠিক নয়।

প্রশ্ন-৩ ঃ ছোট ও খুচরা ব্যবসায়ীদের খুচরা বা ভাংতি টাকার প্রয়োজন হয়। ফলে তারা প্রায়-ই ভাংতি টাকার সংকটে পড়ে। এ কারণে তাদের ভাংতি বা খুচরা টাকা কিনতে হয়। যেমন ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকার নোটের ১ হাজার টাকা কিনতে হয় ১ হাজার পঁচিশ-ত্রিশ টাকায়। আমার জানার বিষয় হলো, এভাবে টাকা দিয়ে টাকা কেনা-বেচা করা শরীআহ সম্মত কি না?

আব্দুল হক, বাগেরহাট।

উত্তর : টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেন করা হলে অবশ্যই সমান সমান বা সমপরিমাণ হতে হবে। সমপরিমাণ হলে সেটা জায়েয ও হালাল হবে। সমপরিমাণ না হয়ে কম-বেশি হলে সেটা সুদ হিসেবে গণ্য হবে, যা সুস্পষ্ট নাজায়েয ও হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বন্ধ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৩০)

২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকার নোট যেমন টাকা তেমনি এক হাজার টাকার নোটও টাকা। খুচরা এবং বড় নোটের পার্থক্যে এবং চাহিদার তারতম্যে টাকার মূল্যমানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পার্থক্য সূচিত হয় না। অতএব, টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেন কম-বেশি করা হলে সেটা অবশ্যই সুদ হিসেবে গণ্য হবে। খুচরা টাকার নোট ও বড় টাকার নোটের পার্থক্যে এবং চাহিদার তারতম্যে টাকার পরিমাণে কম-বেশি করা শরী'আহ সম্মত হবে না এবং হালালও হবে না।

প্রশ্ন-৪ ঃ এক ব্যক্তি একা একা ফরয সালাত আদায় করছিলো। ইতোমধ্যে জামা'আত শুরু হয়ে গেলে উক্ত ব্যক্তি কি তার সালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আমতে শামিল হবে?

আহমাদ উল্লাহ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির সালাত যদি দুই রাক'আত বিশিষ্ট হয় এবং তার প্রথম রাক'আতের সাজদা করার আগেই যদি জামা'আত শুরু হয়ে যায় তাহলে তিনি তার সালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শামিল হয়ে যাবেন। আর যদি লোকটি প্রথম রাক'আতের সাজদা করে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতের সাজদা এখনো করেনি এমন সময় জামা'আত শুরু হলে তিনি তার সালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শামিল হবেন। অবশ্য লোকটি যদি দ্বিতীয় রাক'আতের সাজদাও করে ফেলেন তাহলে তিনি তার সালাত পূর্ণ করবেন। এরপর ইচ্ছা

করলে তিনি জামা'আতে শামিল হতে পারেন যা তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে।

উক্ত ব্যক্তির সালাত যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট হয় এবং প্রথম রাক'আতের সাজদা যদি না করে থাকেন তাহলে তিনি তার সালত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শামিল হবেন। আর যদি প্রথম রাক'আতের সাজদা করে থাকেন তাহলে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে জামা'আতে শামিল হবেন। আর যদি তিনি তৃতীয় রাক'আতের সাজদা করে থাকেন তাহলে সালাত (চার রাক'আত) পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে নফল সালাত হিসেবে ইমামের সাথে জামা'আতে শামিল হতে পারেন বা হবেন। আর এটা আসরের সালাত হলে সালাত (চার রাক'আত) শেষ করার পর নফল সালাত হিসেবে জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে না। কেননা আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল সালাত আদায় করা যায় না।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার সেটা হলো- দুই রাক'আত বিশিষ্ট সালাতে বলা হয়েছে, যদি লোকটি প্রথম রাক'আতের সাজদা করেছেন কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতের সাজদা এখনো করেন নি এমন সময় জামা'আত শুরু হলে সালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শামিল হতে হবে। চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতে এর কিছুটা বিপরীত কথা বলা হয়েছে। সেটা হলো: যদি প্রথম রাক'আতের সাজদা করে থাকেন তাহলে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে জামা'আতে শামিল হবেন। এটা দু'রাক'আত ও চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতের মাস'আলাগত পার্থক্য মাত্র।

প্রশ্ন-৫ ঃ মুসল্লীদের মধ্যে এমন কিছু মুসল্লী আছেন যারা রুকূ' ও সাজদায় যাওয়া এবং রুকূ' থেকে মাথা উঠানো এবং সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ানো ইত্যাদি কাজে বেশ দ্রুতগামী। এমনকি অনেককে ইমামের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যেতে দেখা যায়। এদের সালাতের বিষয়ে ইসলামের বিধান জানতে চাই

মাসনূন জারীর, নড়াইল।

উত্তর : প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন থেকে জানা গেল যে, মুসল্লীগণের মধ্যে কিছু মুসল্লী আছেন যারা রুকূ'-সাজদায় যাওয়া, রুকূ' ও সাজদা থেকে সোজা হয়ে উঠা বা বসা প্রভৃতি কাজে দ্রুতগামী। পক্ষান্তরে ইমামগণের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন বয়স্ক, ভারী শরীরের, কেউ কেউ রুকূ' ও সাজদায় যাওয়ার শুরুতেই তাকবীর বলা শুরু করেন। ফলে ঐ দ্রুতগামী মুসল্লীগণ ইমামের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। এটা শরী'আহ সম্মত নয়। এ কাজগুলো শরী'আহ সম্মতভাবে করতে হলে আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছের শিক্ষা অনুযায়ী করতে হবে। এক্ষেত্রে ইমামগণের কিছু করণীয় আছে এবং মুসল্লীগণেরও কিছু করণীয় আছে। উভয়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। ইমামগণের করণীয় হলো- ইমাম সাহেব রুকূ' ও সাজদায় এমন সময় তাকবীর বলবেন যেন মুক্তাদী দ্রুতগামী হলেও ইমামের আগে রুকু' বা সাজদায় যাওয়ার সুযোগ থাকবে না। আর মুসল্লীগণের করণীয় হলো- ইমামের তাকবীর শোনার পরে তারা রুকু' বা সাজদায় যাওয়া শুরু করবেন।

"বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মিথ্যাবাদী নন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহু বলার পর যতক্ষণ পর্যন্ত সাজদায় না যেতেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ বাঁকা করতেন না। তিনি সাজদায় যাওয়ার পর আমরা সাজদায় যেতাম। (সহীহ আল বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ মুক্তাদীগণ কখন সাজদায় যাবেন, হাদীছ নং-৬৯০)

সহীহ আল বুখারীর অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা) থেকে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে (রুকূ' সাজদা থেকে) মাথা উঠিয়ে ফেলে তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দেবেন। তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দিবেন। (সহীহ আল বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ মুক্তাদীগণ কখন সাজদায় যাবেন, হাদীছ নং-৬৯১)

এই হাদীছে জামা'আতে সালাত আদায়ে যে কোন কাজে বা 'আমলে ইমামের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, জামা'আতে সালাত আদায়ে কোন অবস্থাতে ইমামকে অতিক্রম করা যাবে না। বরং সালাতের সব কাজে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। ইমামের অনুসরণ না করে অগ্রগামী হয়ে কোন কাজ করলে তার জন্য কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সুনান আবু দাউদের একটি হাদীছে এসেছে-

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তাঁর অনুসরণ করার জন্য। কাজেই ইমাম যখন তাকবীর বলে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। তোমরা তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না ইমাম তাকবীর বলে। ইমাম যখন রুকূ' করে তখন তোমরাও রুকূ' করবে। তোমরা রুকূ করবে না, যতক্ষণ না ইমাম রুকূ' করে। ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামীদাহ" বলে, তোমরা বলবে "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদু"। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছেঃ "ওয়া লাকাল হামদু" (তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা)। ইমাম যখন সাজদা করে, তোমরাও সাজদা করবে। তোমরা সাজদা করবে না, যতক্ষণ না ইমাম সাজদা করে। (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদ-৬৯, ইমামের বসে বসে সালাত আদায় করানো, হাদীছ নং-৬০৩)

উপরিউক্ত হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়, জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ে ইমামের অনুসরণ করা জরুরী ও অবশ্য কর্তব্য। ইমামের অনুসরণ করার অর্থ হলো, ইমামের পরপরই করা। অর্থাৎ ইমামের আগেও নয়, একেবারে সাথে সাথে নয়, আবার বেশি পরেও নয়। ■

ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।